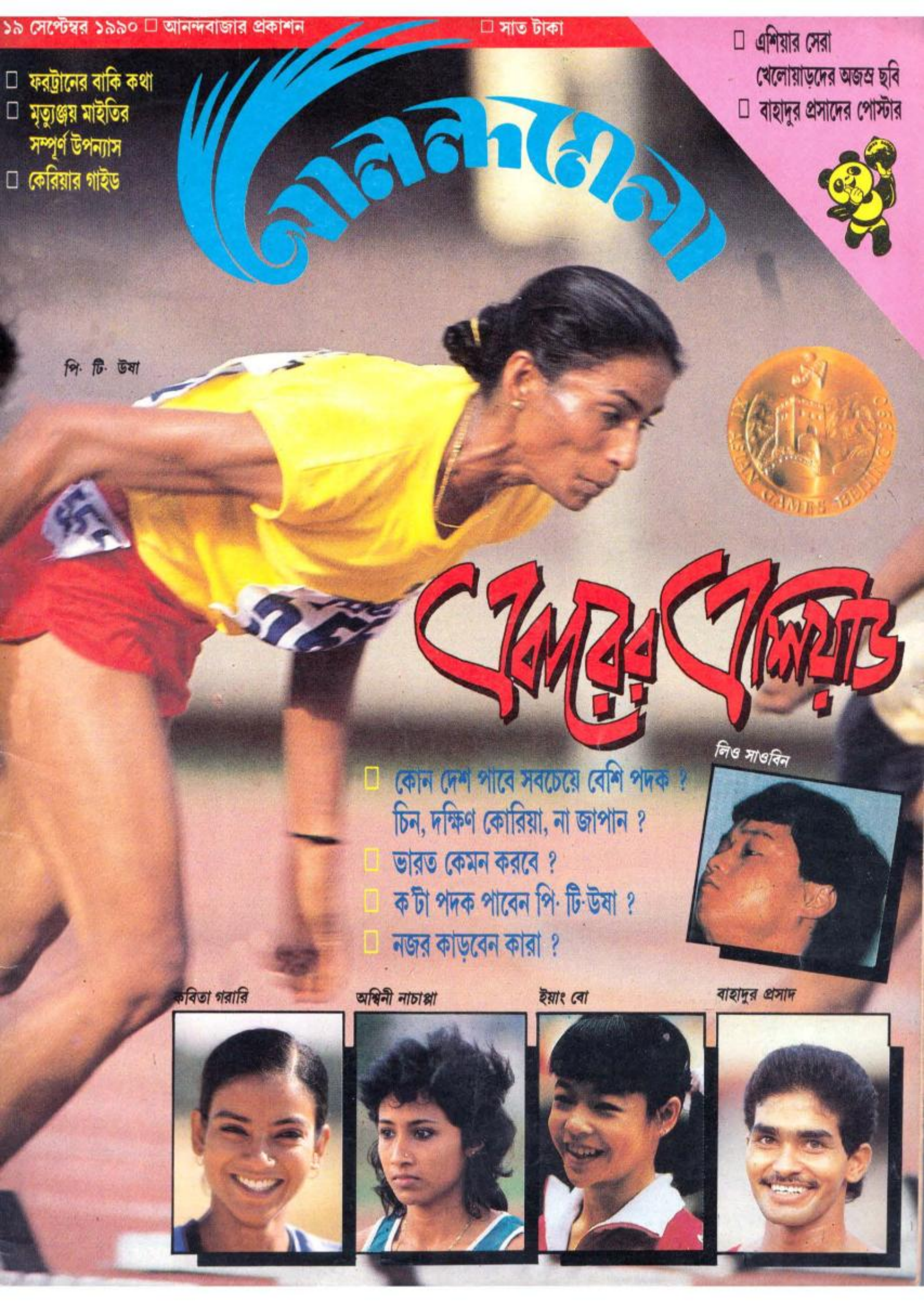

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ ☐ আনন্দবাজার প্রকাশন
☐ সাত টাকা
আনন্দমেলা
☐ ফরট্রানের বাকি কথা
☐ মৃত্যুঞ্জয় মাইতির সম্পূর্ণ উপন্যাস
☐ কেরিয়ার গাইড
☐ এশিয়ার সেরা খেলোয়াড়দের অজস্র ছবি
☐ বাহাদুর প্রসাদের পোস্টার
পি· টি· উষা
খবরের এশিয়াড
☐ কোন দেশ পাবে সবচেয়ে বেশি পদক ? চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, না জাপান ?
☐ ভারত কেমন করবে ?
☐ ক'টা পদক পাবেন পি· টি·উষা ?
☐ নজর কাড়বেন কারা ?
লিও সাওবিন
কবিতা গরারি
অশ্বিনী নাচাপ্পা
ইয়াং বো
বাহাদুর প্রসাদ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

চোখ এর আমার মত...
নাক এর আমার মত... হাসি এর আমার মত
কিন্তু ত্বক আমার এর মত

এইটাই সন্তুর সাবানের বিস্ময়! সন্তুর, হলুদ আর চন্দনের গুণে আমার ত্বক বহু বছর পর্যন্ত তরুণী সুলভ উজ্জ্বল ও ফুলের মত কোমল রাখে। তাইতো সবাই বলে, আমরা দুজন একদম একই রকম দেখতে।

সন্তুর
হলুদ-চন্দনযুক্ত সাবান

জীবনে আনে লাবণ্য

WIPRO LIMITED Closer to the consumer.

ULKA-13371 BEN

২ আশ্বিন ১৩৯৭ □ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ) ■
ইস্কুলের ছুটি মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ৫৫
■ গল্প ■
রাজাকে নিয়ে মজা বিকাশ বসু ৪৪
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ৬
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
এবারের এশিয়াড তানাজি সেনগুপ্ত ১২
প্রথম থেকে দশম এশিয়াড তমাল রায় ২২
পদক-তালিকায় শীর্ষে থাকবে চিন আশিস সরকার ২৫
বিশ্বক্রীড়ায় দক্ষিণ কোরিয়া··· সব্যসাচী সরকার ২৬
জাপানের পদকসংখ্যা··· সমীরণ ঘোষ ২৭
ভারত কেমন করবে সুজিত দাশগুপ্ত ২৯
এশিয়াডে বাংলার মেয়েরা সমীরণ সেন ৩০
ভারতের সোনাজয়ী ৩২
■ কেরিয়ার গাইড ■
রাজকুমারী অমৃতা কাউর কলেজ অব নার্সিং অমর দাশ ৭৮
■ কমিক্স ■
রোভার্সের রয় ৩৯, গাবলু ৫৩, টারজান ৫৪, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■
ফরট্রানের বাকি কথা অসীমরতন ঘোষ ৩৪
■ টাকাকড়ি ■
দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা··· ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫২
■ কবিতা ■
রাজজ্যোতিষী কমলেন্দু সরকার ৭৬
■ খেলাধুলো ■
পঞ্চম এশিয়াডে বাহাদুর প্রবীর বসু ৩৭
রঙিন পোস্টার : বাহাদুর প্রসাদ ৪১, লিম্বা রাম ৪২
■ নিয়মিত বিভাগ ■
চিঠিচাপাঠি ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৩৮, আঁকিবুকি ৪৬, হাসিখুশি ৪৬, শব্দসন্ধান ৫৮, আকাশে ওড়ার কথা ৬৬, কুইজ ৬৮, ক্যাম্পাস ৮০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২

আর কয়েকদিনের মধ্যেই চিনের বেজিং-এ শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস। এশিয়ার সেরা ক্রীড়ানুষ্ঠান এশিয়ান গেমস অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবল কিংবা ওলিম্পিকের মতো সারা বিশ্বে শোরগোল তোলে না। তবু এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিশেষ এক তাৎপর্য আছে আমাদের কাছে। আমাদের অ্যাথলিটরা এশিয়ার মানে কতটা উন্নতি করছেন, তা এই গেমস থেকেই বোঝা যায়। এশিয়ার সেরা মহিলা অ্যাথলিট পি·টি·উষা এখনও আমাদের আশা-ভরসা। এটাই তাঁর শেষ এশিয়ান গেমস। শটপাটে বাহাদুর সিং এই নিয়ে পাঁচ-পাঁচবার এশিয়াডে অংশ নিচ্ছেন। আছেন দৌড়বীর বাহাদুর প্রসাদ, যাঁর পদক জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। সব মিলে, এশিয়াডের দিকে আমরা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি। আর যাঁরা অংশ নিচ্ছেন, তাঁরা কেমন করেন জানার জন্য আমরা উন্মুখ থাকলাম।

৩৭

একটানা পাঁচ-পাঁচটি এশিয়াডে অংশ নিতে যাচ্ছেন ভারতের বাহাদুর সিং। শটপাটে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিগত চারটি এশিয়াডের মধ্যে তিনটিতেই তিনি পদক জিতেছেন। সোনে অবশ্য পাননি। কিন্তু বেজিংয়ে হয়তো আবার ভেলকি দেখাবেন বাহাদুর সিং। প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়ে আসছেন, তার তুলনা মেলা ভার। মানুষ হিসেবেও বাহাদুর অতুলনীয়।

৭৮

অসুস্থ মানুষের সেবা করেন নার্সরা। আমরা তাঁদের বিশেষ মর্যাদা দিই। কেরিয়ার হিসেবে নার্সিং যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। নার্সিং শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে এবার আলোচনা করা হয়েছে কেরিয়ার গাইড বিভাগে।

■ আগামী সংখ্যায় ■

চঞ্চল পাল ও সব্যসাচী সরকারের প্রচ্ছদকাহিনী
গুপ্তচর

সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস (প্রথমাংশ)
চাঁদের মাঠে ওয়ান ডে

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প
একেই কি বলে কুয়াশা

শুক্তি চৌধুরীর গল্প
বাড়ি ফেরার পর

আপনার আদরযত্নের
সঙ্গে সঙ্গে ওকে দিন
কমপ্লান !
Complan
বাচ্চার সুস্থসবল থাকা খুবই দরকার, বিশেষ করে লেখাপড়া শেখার সময়। কমপ্লানে ২০% প্রোটিন আছে - যা ওদের সেরা দুধের প্রোটিন যোগায়।
এছাড়া আছে, ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ - যেমন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, রকমারি ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ - বাড়তি পুষ্টির জন্যে এসবই ওদের দরকার। আপনার বাচ্চাদেরও কমপ্লান খাওয়াতে শুরু করুন - দিনে দুবার প্রতিদিন।
Complan
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
কমপ্লান ®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

GX/59/234 BEN

ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে

১৮ এপ্রিল সংখ্যায় 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগে 'ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট' লেখাটি পড়লাম। লেখক অমর দাশকে ধন্যবাদ। আমি এবার বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। বি· এসসি· অনার্স পাশ করে ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। তাই এ-বিষয়ে যদি আরও বিস্তারিত জানান, আমার পক্ষে খুব ভাল হয়।

বিজয়কৃষ্ণ পাল
ঘোলা বাজার, ২৪ পরগনা

লেখকের উত্তর : ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিতে এম· এসসি· কোর্স নিয়ে আমরা বিস্তারিত লিখেছি। তবু সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই—এটি দু' বছরের কোর্স। এই বিষয় নিয়ে পড়তে হলে সিস্টেমেটিক্স, অ্যানাটমি, মর্ফোলজি, জেনেটিক্স, ফিজিওলজি, ইনভার্টিবল বায়োলজি বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। অর্থাৎ এই কোর্সে ভর্তির জন্য বটানি, জুলজি, লাইফ সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স—যে-কোনও বিষয় নিয়ে কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ১০+২+৩ পর্যায়ে অনার্স কোর্সে পাশ করতে হবে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভর্তির জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়। এজন্য সারা দেশ জুড়ে এনট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয়। খুবই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে নেওয়া হয় পার্সোন্যালিটি টেস্ট এবং অ্যাপটিচুড টেস্ট। ওয়াইল্ড লাইফ বিষয়ে অ্যাপটিচুড থাকা চাই।

কেরিয়ার গাইড

কেরিয়ার গাইড বিভাগটি থেকে আমি নতুন-নতুন জীবিকা সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর পাই। আপনারা যদি এই বিভাগে সিনেমা-পরিচালক হতে হলে কী করতে হবে জানান, খুব ভাল হয়। ভারতের কোথায়-কোথায় এই বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ আছে এবং পশ্চিমবঙ্গে কোথায়-কোথায় এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায় যদি জানান, তা হলে আমার খুব উপকার হয়।

সুভাষ সাহা
শিলিগুড়ি

সম্পাদকীয় উত্তর : ৫ এপ্রিল ১৯৮৯ সংখ্যায় 'ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া' নিয়ে কেরিয়ার গাইড বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। ওই লেখাটি পড়লে আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

বিশ্বসেরা ফুটবলারদের ছেলেবেলা

আমি আনন্দমেলার একজন নিয়মিত পাঠিকা। আনন্দমেলার 'খেলাধুলো' বিভাগটি আমার একান্ত প্রিয়। ১৭ জুন, 'বিশ্বকাপে কারা ফেভারিট' এবং ১১ জুলাই, 'বিশ্বসেরা ফুটবলারদের ছেলেবেলা' এই বিশেষ সংখ্যা দুটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই সংখ্যা দুটি থেকে আমরা বিশ্বসেরা ফুটবলারদের অতীত ও বর্তমান জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। কিন্তু টিভির পরদায় ফেভারিট দল জার্মানির পেনাল্টিতে জেতা দেখে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হল না। আমরা বিশ্বের সেরা পুরুষ ফুটবলারদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। এবার ফুটবলে মেয়েদের অনুপ্রবেশ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশেষ তথ্যপূর্ণ লেখা আনন্দমেলায় পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

নাসিম ফারহানা ও রুনা লায়লা
যদুরবেড়িয়া, হাওড়া

পেলে (বাঁ দিকে), বোন মারিয়া লুসিয়া ও ভাই জোকা

১১ জুলাই সংখ্যায় 'পেলে প্রেরণা পেয়েছেন বাবার কাছে' পেলের ছেলেবেলা সম্পর্কে লেখাটি পড়লাম। কিন্তু লেখক এই লেখাটিতে পেলের ছেলেবেলার কোনও ঘটনার উল্লেখ করেননি। আমি একটি ঘটনার কথা লিখছি। ছাপা হলে দারুণ খুশি হব।

পেলের বয়স যখন সাত, তখন পেলে হাতে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে স্টেশনে-স্টেশনে, 'পালিশ! পালিশ! জুতো পালিশ' বলে চেঁচিয়ে লোকজনদের জুতো পালিশ করত। আর বিকেলে মাঠে ছেঁড়া কাপড়ের ফুটবল তৈরি করে একা-একা ফুটবল খেলত। একদিন পেলের বাবা পেলের ছেঁড়া কাপড়ের ফুটবলে খেলা দেখে খুশি হয়ে অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে যখন তাকে একটা ফুটবল কিনে দিলেন, তখন পেলে ফুটবলটা দেখে বলে উঠল, "বাবা, ফুটবলটা একটা ছোট্ট পৃথিবীর মতো দেখতে, না?" বাবা বললেন, "হ্যাঁ। পৃথিবীর মতো দেখতে। তুই পারবি না এই ছোট্ট পৃথিবী দিয়ে আমাদের এই বিরাট পৃথিবীকে জয় করতে?" পেলে বলল, "সুযোগ পেলে চেষ্টা করব।"

পেলের এই চেষ্টার ফলেই পরবর্তীকালে তিনি হতে পেরেছিলেন ফুটবলের প্রবাদপুরুষ।

মলয় মুর্মু
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

পাহাড়ে দূষণমুক্তি ক্যাম্প

হিমালয়ের কোলে এক ছোট্ট শহর, নাম তার মানালি। পাহাড় তার বরফের কেশ এলিয়ে শুকিয়ে নেয়। এরই নাম হিমালয়। বিপুল উচ্চতা আর বিস্ময়কর বিশালত্ব। শান্ত। সমাহিত। দেবভূমির সম্ভ্রম নষ্ট হতে শুরু হয়েছে। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মানুষ পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে নষ্ট করছে। পার্থিব প্রবৃত্তি ও প্রলোভন এর কারণ। গাছ কাটা হচ্ছে। আবর্জনার পাহাড় তৈরি হচ্ছে সর্বকালের সমাদৃত হিমালয়ে। মানুষের ফেলে আসা ময়লা সরাতে এসেছে চন্দননগরের গিরিদূত পর্বতারোহণ সংস্থার পর্বতারোহীরা। পরিষ্কার হবে বেসক্যাম্প যেখানে রয়েছে অভিযাত্রীদের ফেলে আসা জঞ্জাল। হিমালয়ের এই দূষণমুক্তি অভিযানে প্রয়োজন অসীম মনোবল, দুর্জয় সাহস আর কিছু দুঃসাহসী মানুষ। উত্তেজনার উষ্ণস্পর্শ রইল আনন্দমেলার ছোট্ট বন্ধুদের জন্য, যারা বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ-পাঠের শিক্ষা নেবে।

লিপিকা ঘোষ
দলনেত্রী,
গিরিদূতের শিগরিলা
দূষণমুক্তি অভিযান

ধারাবাহিক উপন্যাস

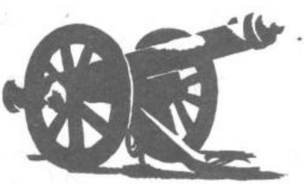

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

হাবু সম্পর্কে অর্জুনের একটা কৌতূহল আছে। অনেকদিন ধরে দেখে আসছে সে এই লোকটাকে। অমলদা কোত্থেকে ওকে পেয়েছিলেন, কেমন করে হাবু এতসব শিখে গেল, তা কখনওই গল্প করেননি। আজকাল অমলদা অনাবশ্যক কথা বলেন না। হাবুর গায়ে ভীষণ জোর, বুদ্ধি মাঝে-মাঝে খুলে যায়, কিন্তু বোবা-কালা মানুষটি অমলদার পাহারাদার ওরফে রাঁধুনি ওরফে মালি ওরফে সবকিছু হয়ে দিব্যি রয়ে গেছে। মোটরবাইকের পেছনে বসে হাবু শক্ত হাতে তাকে ধরে আছে এখন। ওকে আঙুল আলগা করতে বলে কোনও লাভ নেই, হাবু শুনতেই পাবে না।

সনাতন নামের সেই লোকটা যখন অমলদার বাড়িতে এসেছিল তখন মোটেই খুশি হয়নি হাবু। তখন সনাতন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। লোকটা সত্যি অদূর ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে। অমলদা সনাতনকেও কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন তাও রহস্য। হাকিমপাড়ায় ঢুকে মোটরবাইক যখন বাঁক নিচ্ছে তখন পিঠে মৃদু টোকা মারল হাবু। অর্জুন বাইকটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করাতেই টপ করে নেমে পড়ল হাবু। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল ?"

যে মানুষ ওর সঙ্গে কথা বলছে তার ঠোঁটনাড়া দেখতে পেলে হাবু যেন বুঝতে পারে। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে হাত নেড়ে ওপাশের দোকানগুলো দেখিয়ে হাঁটা শুরু করল। অর্থাৎ সে কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরবে। অনেকদিন আগে অর্জুন একবার অমলদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বোবা-কালা একজন মানুষের সঙ্গে থাকতে অসুবিধে হয় না ?" অমলদা মাথা নেড়েছিলেন,"আমার খুব সুবিধেই হয়। বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে। নিজের মনে কাজ করতে পারি। অনবরত কারও বকবকানি শুনতে হয় না।"

গেটের সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল অর্জুন। অনেকখানি ঘষটে গিয়ে দাঁড়াল বাইকটা। মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছে হয় সার্কাসের বাইকওয়ালার মতো কোনও ছোট নালা বাইক নিয়ে টপকে যেতে। এখনও ঠিক সাহসটা আসছে না।

গেট খুলে পা বাড়াতেই অমলদার হাসির শব্দ শোনা গেল। বেশ প্রাণখোলা হাসি। অনেককাল অমলদাকে এভাবে হাসতে শোনা যায়নি। আর-একটু এগোতে একটা গলা কানে এল, "তার মানে নিরোর সময় বাঙালি বলে কোনও জাত ছিল না ? ইস, এখন নিজেকে একেবারে যাকে বলে ভুঁইফোড়, তাই মনে হচ্ছে।"

এই গলা ভোলার নয়। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে দরজায় দাঁড়াতেই বিষ্টুসাহেবকে দেখতে পেল অর্জুন। পা ছড়িয়ে বসে আছেন। রোগা বেঁটেখাটো মানুষটাকে এখন আরও বুড়ো দেখাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই তিনি চিৎকার করলেন, "আরে, তৃতীয় পাণ্ডব, এ যে একেবারে নবীন যুবক, ভাবা যায় ?"

অর্জুন ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে প্রণাম করল, "কেমন আছেন ?"

বিষ্টুসাহেব দু' হাতে বাতাস কাটলেন, "নতুন শক্তি পেয়েছি হে। আমেরিকানরা আমার শরীরের যেসব জায়গা রোগের কামড়ে বিকল হয়েছিল তা ছেঁটেকেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার পর আর কোনও প্রব্লেম নেই।" নিজের বুকে হাত দিলেন তিনি, "বাইপাস সার্জারি।"

অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। সে বিষ্টুসাহেবের পাশে গিয়ে বসল। তার চোখের সামনে এখন কালিম্পং-এর দিনগুলো, লাইটার খুঁজতে আমেরিকায় যাওয়া, আর বিষ্টুসাহেবের হাসিখুশি মুখ ক্রমশ রোগে পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া ছবিগুলো ভেসে গেল। বিষ্টুসাহেব যে

আবার এমন তরতাজা কথা বলবেন তা কল্পনা করতে পারেনি সে। অমলদা বললেন, "অর্জুনকে তো দেখা হয়ে গেল, এবার খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করুন। অনেকদূর পাড়ি দিতে হয়েছে আমাকে।"

মাথা নাড়লেন ছোট্টখাট্টো মানুষটি। একমুখ হাসি নিয়ে চুপ করে রইলেন খানিক। তারপর বললেন, "নো পরিশ্রম। জে এফ কে থেকে হিথরো ঘুমিয়ে এসেছি। হিথরোতে কয়েক ঘণ্টা চমৎকার কেটেছে। হিথরো থেকে দিল্লি নাক ডাকিয়েছি। দিল্লিতে এক রাত হোটেলে। উত্তেজনায় ভাল ঘুম হয়নি অবশ্য। আর দিল্লি থেকে বাগডোগরা আসতে ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না। দেশের মাটিতে ফেরার উত্তেজনার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা করাই চলে না। এখন আমি একটুও ক্লান্ত নই।"

"আপনি একাই এতটা পথ এলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ইচ্ছে ছিল তাই, কিন্তু আর-একজনকে বয়ে আনতে হল।" বিষ্টুসাহেব চোখ বন্ধ করলেন, "মেজর এসেছেন সঙ্গে। তিনি গিয়েছেন কালিম্পঙে।"

"অ্যাঁ, মেজর এসেছেন!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অর্জুন।

হঠাৎ অর্জুনের গায়ে হাত বোলালেন বিষ্টুসাহেব, "নাঃ, এই ছেলেটা দেখছি একদম বড় হয়নি। সেই ফ্রেশনেশটা এখনও ধরে রেখেছে। বড় হলেই মানুষ কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। এবার ক'দিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে, কেমন?"

জমিয়ে আড্ডা বলে কথা! অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে! অমলদা, বিষ্টুসাহেব, মেজর ও সে। কতদিন পরে এক জায়গায় হওয়া যাবে! সে জানত মেজর আসছেন দিন-দুয়েকের মধ্যেই। এখানে ওঁরা কয়েকদিন থাকবেন।

বেলা বাড়ছিল। বিষ্টুসাহেবের ইচ্ছে ছিল অর্জুন এখানেই খেয়ে নিক। কিন্তু অমলদাই আপত্তি করলেন। বাড়িতে বলা নেই, অর্জুনের মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। তাই বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে অর্জুন বিকেলে চলে আসুক।

বিষ্টুসাহেব ভেতরে চলে গেলে অমলদা বললেন, "যাও, আর দেরি কোরো না। ও হ্যাঁ, কিছুটা আশা করি এগিয়েছ এর মধ্যে!"

"হ্যাঁ। ইতিহাস জানলাম। তবে আলগা-আলগা।"

"পাঁচশো বছরের আগে যাওয়ার দরকার নেই। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শুরু করো। ওই সময় কেউ তো ইতিহাস লিখব বলে লেখেনি।"

"আপনি মোটামুটি বাঙালির ইতিহাসটা জানেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"যেটুকু না জানাটা অপরাধ সেটুকুই জানি।" অমলদা হাসলেন, "অর্জুন, তুমি তোমার ক'জন পূর্বপুরুষের নাম জানো?"

অর্জুন মনে করার চেষ্টা করল। বাবা-ঠাকুর্দার নাম ধর্তব্যের মধ্যে আসছে না। বাবার ঠাকুর্দার নাম সে জানে। মা বলেছিলেন বাড়িতে একটা কাগজে চোদ্দপুরুষের নাম নাকি লিখে রেখেছিলেন বাবা। তিনি মারা যাওয়ার পর সে আর ওই কাগজপত্র দেখেনি। তাই পূর্বপুরুষ বলতে তার আগের তিন পুরুষেই এখন তাকে থেমে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ এটা মনে হতে লজ্জা করল অর্জুনের। আমরা বাহাদুর শা'র পূর্বপুরুষদের নাম জানি অথচ নিজের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে উদাসীন। বাবার লেখা কাগজটা যদি না পাওয়া যায়, মায়ের যদি সেসব মনে না থাকে তা হলে তাদের বংশের অতীত মানুষগুলো চিরকালের জন্য অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন।

অমলদা বললেন, "ঠিকই, জেনে রাখা ভাল, কিন্তু দরকার পড়ে না বলে তিন-চার পুরুষের বেশি খবর রাখি না। চার পুরুষ মানে একশো বছর। কালাপাহাড় ছিলেন তোমার কুড়ি পুরুষ আগে। ব্যাপারটা তাই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। বিকেলে এসো, এ-ব্যাপারে কথা বলা যাবে।"

মোটরবাইকে উঠে অর্জুনের হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। এই যে আমরা পুরুষ-পুরুষ করি, কেন করি? কেন বাবা-ঠাকুর্দাকে ধরে প্রজন্ম মাপা হচ্ছে এবং তাকে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হবে? মা-দিদিমাকে ধরে নারী শব্দটাকে পুরুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন? আজ যখন ছেলেমেয়ে সমান জায়গায় এসে গিয়েছে তখন মেয়েরা এই পুরুষ-মাপা প্রথাটার বিরুদ্ধে কথা বলতেও তো পারে!

দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন। জলপাইগুড়ির ইতিহাস জানেন এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া দরকার। তার ছেলেবেলায় চারুচন্দ্র সান্যাল নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, যাঁর নখদর্পণে এসব ছিল বলে সে অমলদার কাছে শুনেছে। রূপশ্রী সিনেমার সামনে এসে সে বাইক থামাল। জগুদা আর-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ভদ্রলোকের মুখে দাড়ি, কাঁধে ব্যাগ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে। তাকে দেখে জগুদা হাত তুললেন। মালবাজার ঘুরে এখন জগুদার অফিস শিলিগুড়িতে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেন। এই অসময়ে এখানে কেন প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সে।

জগুদা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "এই যে, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনাকে বলেছিলাম। এরই নাম অর্জুন, আমাদের শহরের গর্ব। বিলেত আমেরিকায় গিয়েছিল সত্যসন্ধান করতে। আর ইনি হলেন ত্রিদিব দত্ত। মন্দির নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন। কলকাতার কলেজে পড়ান।"

মন্দির নিয়ে গবেষণা করার কথা শোনামাত্র অর্জুনের মনে পড়ল

কালাপাহাড়ের কথা। কালাপাহাড় তো একটার-পর-একটা মন্দির ভেঙেছেন। ইনি নিশ্চয়ই সেসব খবর রাখেন! সে নমস্কার করল। ত্রিদিববাবু বললেন, "আমরা এখানকার দেবী চৌধুরানির তৈরি মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই ভাই তোমার কথা ইনি বলছিলেন।"

"আমার কথা কেন?"

"এ-দেশে মন্দিরের সঙ্গে অপরাধের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই কিছুকাল আগেই ডাকাতরা ডাকাতি করার আগে কালীর মন্দিরে পুজো দিতে যেত। সেই প্রসঙ্গে অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে-করতে অপরাধ-সাহিত্য থেকে গোয়েন্দাদের কথা এসে গেল। আমি ভাবতে পারছি না জলপাইগুড়ির মতো শহরে কেউ শুধু এই কাজ করে কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে? এখানে কেস কোথায়?"

"অপরাধী তো সব জায়গায় থাকে।" অর্জুন বলতে-বলতে দেখল ভদ্রলোকের কাঁধের কাপড়ের ব্যাগের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট লাঠির ডগা দেখা যাচ্ছে। লাঠিটা বেশ চকচকে এবং গোল।

জগুদা বললেন, "চললে কোথায় অর্জুন?"

"একটু ইতিহাস খুঁজতে। জগুদা, জলপাইগুড়ির ইতিহাস ভাল কে জানেন?"

"মলয়কে বলতে পারো। ওরা এসব নিয়ে থাকে।" এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। জিপটাকে অর্জুন চেনে। ভাড়া খাটে। জগুদা বললেন, "হাতে সময় থাকলে আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারো।"

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"জল্পেশের মন্দির দেখতে। ত্রিদিববাবু এর আগেও ওখানে গিয়েছেন কিন্তু আর-একবার ওঁর যাওয়া দরকার।"

অর্জুন মনে করতে পারছিল না আজ সকালে মাস্টারমশাই কালাপাহাড় সম্পর্কে বলতে গিয়ে জল্পেশের মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছিলেন কি না। কিন্তু কালাপাহাড় যদি এই অঞ্চলে থেকে থাকেন তা হলে ওই মন্দির নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছিল। জল্পেশের মন্দির তো আরও প্রাচীন।

নিরালার পাশে মোটরবাইক রেখে অর্জুন জিপে উঠে বসল। এখন তিনটে বাজে। হয়তো ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। কিন্তু অর্জুনের মনে হচ্ছিল একবার যাওয়া দরকার। হাসপাতালের সামনে দিয়ে রায়কতপাড়া পেরিয়ে জিপ ছুটছিল। ত্রিদিববাবু এবং জগুদা ড্রাইভারের পাশে বসে ছিলেন। পেছনে বসে পিছলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে অর্জুন চুপচাপ ভাবছিল। রাজবাড়ির গেটের সামনে দুটো ছেলে হাতাহাতি করছে। তাদের ঘিরে ছোট্ট ভিড়। তারপরেই জিপ শহরের বাইরে। তিস্তা ব্রিজ সামনে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল সে অতীত নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছে। অথচ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন বর্তমানের কালাপাহাড় নামক এক অজ্ঞাত মানুষের কাছ থেকে যে হুমকি দেওয়া চিঠি পেয়েছেন তার কোনও হদিস নেওয়া হচ্ছে না।

হরিপদ সেন তাঁর পিতামহের-প্রপিতামহের লেখা কিছু কাগজপত্রের প্যাকেট অমলদাকে দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে কী লেখা আছে তা অমলদা এখনও বলেননি। আজকাল সব ব্যাপারেই অমলদার উৎসাহ এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে, হয়তো এখনও খুলেই দেখেননি ওগুলো। আগামীকাল হরিপদবাবু শিলিগুড়ি থেকে আবার আসবেন অমলদার বাড়িতে। সেই সময় অমলদা তাঁকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর তা হলে তো সব কাজ চুকে যাবে। অর্জুনের মনে হল আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এখনই এত হাতড়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

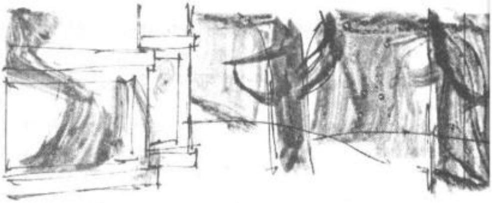

জিপ ততক্ষণে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে দোমহানির দিকে ছুটছে। দু'পাশে মাঠের মধ্যে দিয়ে পিচের রাস্তাটা বেঁকে গেছে ঘোড়ার পায়ের নালের মতো। মানুষজনের বসতি খুব কম। বাইপাস ছেড়ে জিপ ঢুকল বাঁ দিকে। শহর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে জল্পেশের মন্দিরে সে আগেও এসেছে। এ-সবই তার চেনা। মন্দিরে কোনও শিবের মূর্তি নেই, আছে অনাদিলিঙ্গ। কেউ বলেন কোচবিহারের মহারাজ প্রাণনারায়ণ একটি স্তম্ভের মাথায় গাভীদের দধ ছড়িয়ে দিতে দেখে এখানে এই মন্দির স্থাপন করেন।

অর্জুন প্রসঙ্গটা তুলতেই ত্রিদিববাবু বললেন, "খুব গোলমেলে ব্যাপার। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সন্দেহ করেছেন এটি এক বৌদ্ধমন্দির ছিল। মেলার সময় ভোট-তিব্বত থেকে ঘোড়া কুকুর কম্বল নিয়ে বৌদ্ধরা এখানে আসতেন। জল্পেশ্বর নামে এক রাজার কথাও শোনা যায়, যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে কেউ দাবি রেখেছে। আসামের ঐতিহাসিকরা বলেন ভিতরগড়ের পৃথুরাজারই নাম জল্পেশ্বর, যিনি বক্তিয়ার খিলজিকে পরাজিত করেছেন। ভদ্রলোক মারা যান ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে। তার মানে মন্দিরের আয়ু প্রায় আটশো বছর। মাটির ভেতর থেকে শিবলিঙ্গ উঠে এসেছে ওপরে। পঞ্চাশ বছর আগে মন্দিরে সংস্কারের সময় একটা পরীক্ষা চালানো হয়। বোঝা যায় লিঙ্গটি সাধারণ পাথর নয়, উল্কাপিণ্ড। আকাশ থেকে খসে মাটিতে ঢুকে পড়ে। এই আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে এখানকার মানুষ এঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে শুরু করে।"

"এই উল্কাপিণ্ডটা কবে পড়েছিল?"

"সময়টা ঐতিহাসিকরা আবিষ্কার করতে পারেননি।"

জিপ থামল একটা অস্থায়ী হাটের মধ্যে। বোঝা যায় সপ্তাহে এখানে হাট বসে, এখন চালাগুলো ফাঁকা। মন্দিরের সামনে হাতির মূর্তি। ত্রিদিববাবু বললেন, "হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে হাতি খুব একটা মেলে না। সম্ভবত এক সময় এখানে হাতির উপদ্রব হত। পাথরের

হাতি তৈরি করে পাহারায় বসিয়ে তাদের ভয় দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।"

জল্পেশ্বর মন্দিরের ভেতরে অর্জুন ঢুকেছে। অতএব সেদিকে তার কোনও আগ্রহ ছিল না। ত্রিদিববাবু আর জগুদা চলে গেছেন তাঁদের কাজে। অর্জুন দেখল মন্দিরের পাশেই লম্বা বারান্দার একতলা ব্যারাকবাড়ি। সেখানে সম্ভবত দূরের ভক্তরা এসে ওঠেন। মানুষজন খুব কম। মন্দিরের এপাশে একটি পুকুর। সে ভাল করে দেখল। মন্দিরের গায়ে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় কি না। কিছুই চোখে পড়ল না।

পুকুরের ধারে এসে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল অর্জুন, কিন্তু সামলে নিল। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসছেন। তাঁর পায়ে খড়ম, শরীরে সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো পরা, গলায় রুদ্রাক্ষ এবং মুখে পাকা দাড়ি। তিনি হাসলেন, "আহা, মন চেয়েছিল যখন, তখন খাও। আমাকে দেখে সঙ্কোচ কেন?"

অর্জুন আরও লজ্জা পেল। সে প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিল। সন্ন্যাসীর মুখে বেশ স্নিগ্ধ ভাব, "মন্দিরে না গিয়ে এখানে কেন?"

"এমনই। মন্দিরের চেহারা দেখছিলাম। আপনি এখানে অনেকদিন আছেন?"

"দিন গুনিনি। তবে আছি।"

"এই মন্দিরে কবে শেষবার সংস্কারের কাজ হয়?"

"বৈকুণ্ঠপুরের কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত সংস্কার করেন, তাও অনেকদিন হয়ে গেল। সময়ের হিসেব বাবা আমার গুলিয়ে যায়।"

"আচ্ছা, আপনি কি জানেন কালাপাহাড় এই মন্দিরের ওপর আক্রমণ করেছিলেন?"

সন্ন্যাসী হাসলেন, "এ-কথা কে না জানে! মন্দিরের চুড়োটা তখন এরকম ছিল না। কালাপাহাড় তখনকার চুড়ো ভেঙে ফেলেছিলেন। কিন্তু ভগবানের কোনও ক্ষতি করেননি। শোনা যায় মন্দিরের ভেতরেও তিনি ঢোকেননি।"

"আপনি কালাপাহাড় সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"আরে, তুমি বাবার মন্দিরে এসে কালাপাহাড় সম্পর্কে জানতে চাইছ কেন? মজার ছেলে তো! কালাপাহাড়ের শক্তি ছিল, ক্ষমতাও ছিল, সেইসঙ্গে অভিমান এবং অপমানবোধ প্রবল। ব্রাহ্মণরা ওঁকে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। এসব আমার শোনা কথা। এই জল্পেশের অনেক বৃদ্ধ মানুষ তাঁদের পিতা-পিতামহের কাছে শোনা কালাপাহাড়ের গল্প এখনও বলেন। তিনি এলেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। তাতে পাঠান যেমন আছে, তেমন এ-দেশের হিন্দুরাও। দেবাদিদেব নাকি তাঁকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন যে, তিনি মন্দিরের ভেতরে পা বাড়াতে পারেননি। তুমি থাকো কোথায়?"

"জলপাইগুড়িতে।"

"তোমাকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কী দেওয়া যায়?" সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কথা বের হওয়ামাত্র পাশের নারকোল গাছ থেকে একটা নারকোল খসে পড়ল মাটিতে ধুপ করে। সন্ন্যাসী সেটা কুড়িয়ে নিলেন, "বাঃ, এইটেই নাও। নাড়ু করে খেও।"

নারকোল হাতে ধরিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। অর্জুন হতভম্ব। এটা কী হল? একেই কি অলৌকিক কাণ্ড বলে? সে পুকুরের দিকে তাকাল। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল এবং শিবমন্দির। হরিপদ সেন যে জায়গাটার কথা বলেছিলেন তা তো জল্পেশ্বর হতে পারে। যদিও এখন চারপাশে কোনও জঙ্গল নেই। কিন্তু পাঁচশো বছর আগে থাকতেও তো পারে। আর তখনই তার মনে পড়ল অমলদার সতর্কবাণী, প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে শুধু নির্বোধরাই আসতে পারে।

(ক্রমশ)

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

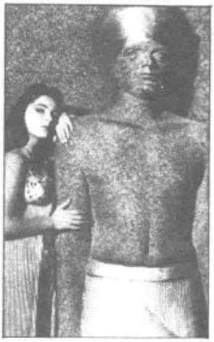

আগের জন্মের রাস্তা

ফ্লোরিডার মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের প্রধান ব্রায়ান ওয়াইস গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মৃদুভাষী এক তরুণী ক্যাথারিনের চিকিৎসা করছিলেন। ক্যাথারিনের রোগ হল কাল্পনিক আতঙ্কের অপ্রত্যাশিত ঝোঁক। শেষ পর্যন্ত সম্মোহনের সাহায্য নিয়ে ওর রোগের মূলে পৌঁছতে চেয়েছেন ওয়াইস। কিন্তু যেই তিনি ওকে বলেছেন, 'তোমার রোগের লক্ষণ যখন প্রথম ধরা পড়েছিল সেই সময়ে ফিরে যাও,' তখনই ক্যাথারিনের উত্তর তাঁকে চমকে দিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৩৬ সালে ক্যাথারিন মিশরে বাস করত। তখন ওর নাম ছিল অ্যারোন্ডা। সেই সময় থেকে বর্তমান রোগলক্ষণের শুরু। ক্যাথারিন আরও বলেছে, 'প্রভু' নামধারী বিদেহী-আত্মারা ওকে নানা খবর জোগায়। যেমন, ওয়াইসের প্রথম সন্তানের হৃদরোগে অকালমৃত্যুর খুঁটিনাটি সবই ও জানে। জানে তাঁর মৃত পিতার হিব্রু নাম। ওয়াইস জোর দিয়ে বলেছেন, 'এসব কেউ জানত না। কোনও ভাবেই এসব খবর ক্যাথারিনের জানার উপায় নেই।' ক্যাথারিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অতীন্দ্রিয় কোনও ব্যাপারে ওয়াইস একটুও বিশ্বাস করতেন না। বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না এমন যে-কোনও জিনিসকেই তিনি বাঁকা চোখে সন্দেহের নজরে দেখতেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রতি লেখা বই 'মেনি লাইভস, মেনি মাস্টার্স'-এ ওয়াইস জানিয়েছেন যে, পুনর্জন্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল।

এ পর্যন্ত ওয়াইস প্রায় ষাটজন মানুষকে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন। এর ফলে তাদের অন্যান্য মনোরোগ মিলিয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে আগের জন্মের স্মৃতি ফিরে পেয়ে দূর হয়েছে ক্যাথারিনের আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা। ওয়াইস বলেছেন, মনের রোগ নয়, পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পেলে মাথাধরা, বদহজম, মনখারাপ ভাব ইত্যাদি নানা উপসর্গ থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
কিন্তু ওয়াইসের ধারণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন পল কুৎস। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার যারা দাবিদার তাদের বিভিন্ন ঘটনার চুলচেরা বৈজ্ঞানিক তদন্তের জন্য রয়েছে এক কমিটি। পল কুৎস সেই কমিটির প্রধান। ওয়াইসের বইটি পড়ার পর কুৎস মন্তব্য করেছেন, 'বইটা আমি খুব খুঁটিয়ে পড়েছি। তাতে জন্মান্তরের প্রমাণ বলে ওয়াইস যেগুলো দাখিল করেছেন সেগুলো কোনও প্রমাণই নয়।

কিন্তু ওয়াইস, বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যে খুশি নন। তাঁর মতে, যেসব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে জন্মান্তরবাদকে মোটামুটি মেনে নেওয়া উচিত।

খুদে দানব

ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারার আলিস কেক পার্কের দিঘিতে কোনও এক রহস্যময় জলচর কচ্ছপদের পা খেয়ে নিতে শুরু করল গত গ্রীষ্মকালে। তারপরে আধখাওয়া শিঙি মাছ ভেসে উঠতে লাগল দিঘির জলে। অবশেষে অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া গেল, ক্ষুরধার দাঁতওয়ালা দুটি পিরানহা মাছ। তাদের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকায়।
ছিপ ফেলে মাছ দুটিকে ধরার চেষ্টা

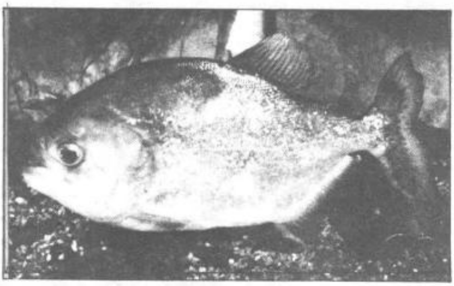

শুরু করল অনেকেই। ইতিমধ্যে ব্যাঙের দল প্রাণভয়ে দিঘি ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। নৌকো, জাল, ছিপ ইত্যাদি নিয়ে পার্কের কর্মীরা, ওয়াইল্ড লাইফ কেয়ার নেটওয়ার্কের সদস্যরা এবং স্থানীয় এক অ্যাকোয়ারিয়াম-বিশেষজ্ঞ নেমে পড়লেন অপরাধীদের বন্দী করার কাজে। আর কৌতূহলী দর্শক তাই দেখতে গাদাগাদি ভিড় জমাল।
শেষ পর্যন্ত বব স্লোন নামে এক পার্ক কর্মী সতেরো ইঞ্চি লম্বা একটি পিরানহাকে গ্রেফতার করতে পারলেন। তবে তার জোড়াটি—যার নাম রাখা হয়েছে অ্যালিস, দিব্যি পালিয়ে বেড়াতে লাগল। তখন ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অব ফিশ অ্যাণ্ড গেম-এর জীববিজ্ঞানী কেন সাসাকি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন অ্যালিসকে পাকড়াও করার জন্য। হাতিয়ার হিসেবে তিনি নিয়ে এলেন ইলেকট্রোশক বন্দুক। কিন্তু কোনওমতেই অ্যালিসকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পেলেন না সাসাকি। বরং দু'জন টিনএজার হুইল-ছিপ দিয়ে ধরে ফেলল অ্যালিসকে। সাসাকি জানিয়েছেন, দৈর্ঘ্যে অ্যালিসও প্রায় দেড় ফুট। ক্যালিফোর্নিয়ায় পিরানহা রাখা বেআইনি। তাই মাছ দুটো মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু ওরা দিঘির জলে গিয়ে আশ্রয় নিল কেমন করে? এর উত্তরে সাসাকি বলেছেন, 'আমার ধারণা, মাছ জোড়া কারও অ্যাকোয়ারিয়ামে ছিল। পরে যখন এরা অ্যাকোয়ারিয়ামের পক্ষে মাপে বেশ বড়সড় হয়ে ওঠে, তখন মালিক ওদের ছেড়ে দেয় এই দিঘিতে। ভাগ্যিস এরা ধরা পড়েছে। নইলে এদের হিংস্র কামড়ে মানুষও জখম হতে পারত।'

জলের অপচয় বন্ধ করতে

সাধারণ শাওয়ারে যে পরিমাণ জল খরচ হয় তার চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ কম জল খরচ করেই শাওয়ার-স্নানার্থীকে একইরকম তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব। যন্ত্রটির নাম ইউরোপা লো ফ্লো শাওয়ারহেড। পিতলের তৈরি এই বস্তুটি পাইপের

গ্রাফিক্সের মাধ্যমে এমন নক

কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কীর্তি

নিউ ইয়র্কের আই বি এম কম্পানির কম্পিউটার-বিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড পিকোভার। পাঁচ বছর ধরে নানা গবেষণা করে চলেছেন কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে। গ্রাফিক্সের মাধ্যমে পিকোভার এমন সব নকশা তৈরি করছেন, যা একেবারে স্বপ্নের দেশের ছবি। এ ছাড়া তিনি কম্পিউটারে 'এঁকেছেন' শামুকের খোলা, চাঁদের পাহাড়, বিচিত্র কীট, সাপ ইত্যাদি। পিকোভারের উদ্ভাবিত পদ্ধতি একইসঙ্গে গ্রাফিক শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে। শামুকের খোলা কেন প্যাঁচানো হয়, যদি এই বিষয়ে কোনও বিজ্ঞানী গবেষণা করে তার তাত্ত্বিক সূত্রটি বের করে ফেলতে পারেন, তা হলে সেই সূত্রের সাহায্যেই কম্পিউটারের পরদায় ফুটিয়ে তোলা যাবে বস্তুটির জীবন্ত ছবি। এই কাজে পিকোভার

সঙ্গে লাগিয়ে নিলেই হল। শতকরা ৭০ ভাগ জল খরচ করে লো ফ্লো শাওয়ারহেড তীব্রবেগে ছুড়ে দেবে জলের রেখা। ভবিষ্যৎ জল-সঙ্কটের কথা ভেবে অথবা সম্ভাব্য জলকরের হিসেব কষে অনেকেই হয়তো বাইশ ডলার দামের এই শাওয়ারহেড কেনার কথা চিন্তা করছেন। ইউরোপা লো ফ্লো শাওয়ারহেড উদ্ভাবন করেছে আমেরিকার সেভেন্থ জেনারেশন কম্পানি।

ওয়ান ফর অল

আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ঝক্কি কমাতে চাও ? তা হলে এর একমাত্র সমাধান 'ওয়ান ফর অল' রিমোট কন্ট্রোল। এই একটি যন্ত্র তেরোরকম রিমোট কন্ট্রোলের কাজ সেরে দেবে নিশ্চিন্তে। যেমন, টিভি, ভি সি আর, কেব্‌ল টিভি বা কমপ্যাক্ট ডিস্কেট প্লেয়ার সহজেই কাজ করবে ওয়ান ফর অলের মাধ্যমে। এর সঙ্গে আলাদাভাবে কিনতে পাওয়া যায় একটি বিশেষ ইলেকট্রনিক কম্যান্ড মডিউল। সেটি জুড়ে নিলে ওয়ান ফর অল ঘরের বাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমনকী চোর ধরার জন্য ঘন্টির ইনফ্রায়েড সঙ্কেতও নিয়ন্ত্রিত করা যাবে এর সাহায্যে।

ট্যান্ডি– ১১০০

ওজন সাড়ে ছ' পাউন্ডের কম, আর মাপে যেন একটা নোটবই। অথচ কোলে বসিয়ে কাজ করার পক্ষে আদর্শ এই কম্পিউটার ট্যান্ডি-১১০০ ক্ষমতায় কম যায় না। এর অপারেটিং সিস্টেম পার্সোনাল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বহু ব্যবহৃত 'এম-এস-ডস'। আর সেইসঙ্গে রয়েছে গ্রাফিক্সের কাজ করার জন্য শক্তিশালী সফটওয়্যার 'ডেস্কমেট'। সুইচ অন করে এই কম্পিউটার চালু করলেই এম-এস-ডসে'র যাবতীয় সঙ্কেত সহজবোধ্য সাধারণ ভাষায় ফুটে উঠবে মনিটরের পরদায়। এ ছাড়া কম্পিউটার-ব্যবহারকারী

কম্পিউটারের সঙ্গে 'কথোপকথনও' চালিয়ে যেতে পারে একটি বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে। কথোপকথন-এর প্রশ্ন ও উত্তরগুলো ফুটে উঠবে মনিটরের ('ডায়ালগ বক্স') একটি নির্দিষ্ট অংশে। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর সুবিধের জন্য ট্যান্ডি-১১০০-এর মধ্যেই রয়েছে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এতে নব্বই হাজার ইংরেজি শব্দের বানান পরীক্ষা করা ও শোধরানোর ব্যবস্থা রয়েছে। চিঠি বা নোট লেখার জন্য এই কম্পিউটারের কোনও ফ্লপি ডিস্কেট ঢোকানোর প্রয়োজন নেই। কারণ এর ভেতরেই রয়েছে সাড়ে তিন ইঞ্চি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ। ট্যান্ডি-১১০০-এর স্মৃতিকোষে তথ্য সঞ্চয়ের ক্ষমতা ৬৪০ কিলোবাইট। আর এর ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেলে আবার চার্জ করে নেওয়া যায়। প্রখ্যাত কম্পিউটার কম্পানি ট্যান্ডি কর্পোরেশনের তৈরি এই ল্যাপটপ মডেলের মাপ লম্বায় ১২·১ ইঞ্চি, চওড়ায় ৯·৮ ইঞ্চি, আর মাত্র ২·৪ ইঞ্চি পুরু।

তরি হয়েছে যা একেবারে স্বপ্নের দেশের ছবি...

এখন সুপার কম্পিউটারের সাহায্য নিচ্ছেন। কোনও নকশার তাত্ত্বিক সূত্রটি কম্পিউটারকে জানানোমাত্রই হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি হয়ে যাচ্ছে হাজারো নকশা। এবং তা থেকে সঠিক নকশাটি মুহূর্তে ফুটে উঠছে রঙিন পরদায়। এ ছাড়া ফ্র্যাক্টাল ইত্যাদির জটিল নকশা ফুটিয়ে তুলতেও

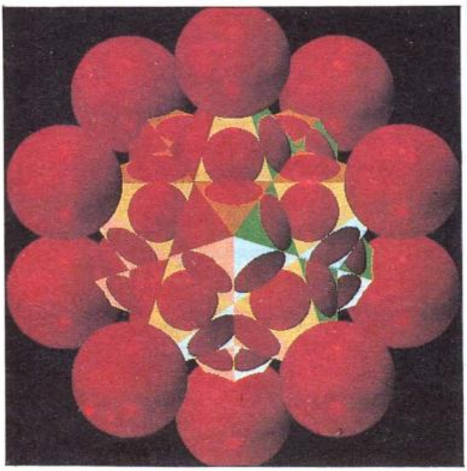

পিকোভারের গ্রাফিক্স পদ্ধতি সমান দড়। সন্দেহ নেই, এই পদ্ধতি পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে। পিকোভারের বিশ্বাস, একদিন এই গ্রাফিক্স পদ্ধতির সাহায্যেই জানা যাবে ছায়াপথের বিবর্তনের রহস্য। ছবিতে পিকোভারের তৈরি কয়েকটি নকশা দেখানো হল।

প্রচ্ছদকাহিনী

এবারের এশিয়াড

চিনের রাজধানী বেজিংয়ে আর কয়েকদিনের মধ্যেই বসছে একাদশ এশিয়াডের আসর। এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রীড়ানুষ্ঠান নিয়ে লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

জিনিয়া আয়ারটন

বাহাদুর সিং

অশ্বিনী নাচাপ্পা

এশিয়ান গেমসকে বলা হয় 'মিনি ওলিম্পিক'। কারণ, ওলিম্পিকের যা আদর্শ ও উদ্দেশ্য এশিয়ান গেমসেরও তাই। এশিয়ান গেমসকে বলা যেতে পারে এশিয়ান ওলিম্পিক।

মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে এশীয় রেকর্ড করেছেন ঝাং চাইহুয়া

মাস কয়েক আগে বিশ্বকাপ ফুটবলের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার পর এশিয়ান গেমস আমাদের ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ফুটবল আমরা যতই ভালবাসি না কেন, বিশ্বকাপের সঙ্গে আমাদের সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ নেই ওলিম্পিকের সঙ্গেও, সেখানে এখন আমরা প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়। বরং এশিয়ার সেরা প্রতিযোগিতা এশিয়ান গেমসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা এশিয়াডে যোগ দেন, অল্প হলেও যখন লড়াইয়ে জিতে শ্রেষ্ঠত্বের নজির রাখেন, পদক গলায় ঝুলিয়ে বিজয়-মঞ্চে দাঁড়ান, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে, ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আকাশে ওড়ে, তখন আমরা গর্ব অনুভব করি। এই অনুভূতি কিন্তু অন্য কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের হয় না। তাই এশিয়াডের গুরুত্ব ও মর্যাদা আমাদের কাছে সর্বদাই আলাদা। চার দশক

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

পি· টি· উষা : এবারও ভারতের সেরা সম্ভাবনা

আগে যে প্রতিযোগিতার শুরু এই ভারতেই, তার একাদশ অনুষ্ঠান হতে চলেছে চিনের রাজধানী বেজিং শহরে, আর কয়েকদিনের মধ্যে। আশা করা যায়, গুরুত্ব, মর্যাদা এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে এবারের এশিয়ান গেমসও কম চিত্তাকর্ষক হবে না।
একাদশ এশিয়ান গেমসের ভার পাওয়ার পরের দিন থেকেই চিনা কর্তৃপক্ষ সুশৃঙ্খলভাবে এর উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দেন। এই প্রথম বেজিংয়ে এত বড় মাপের অনুষ্ঠান হতে চলেছে। একাদশ এশিয়াডকে সাফল্যমণ্ডিত করতে একদিকে যেমন ১·৬০ ইয়েন নিয়ে এগিয়ে এসেছে বারো বছরের মেয়ে ইয়েন, অন্যদিকে তেমনই এক লাখ ইয়েন নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমিক, ৬৩ বছর বয়সী ঝাউ জোংসেন। দেশের স্বার্থে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি তিনি। ব্যক্তিগতভাবে এটাই সর্বোচ্চ সাহায্য।
এশিয়ান গেমসকে বলা হয় 'মিনি ওলিম্পিক'। কারণ, ওলিম্পিকের যা আদর্শ ও উদ্দেশ্য, এশিয়ান গেমসেরও তাই। অর্থাৎ, এশিয়ান গেমসকে বলা যেতে পারে এশিয়ান ওলিম্পিক। ওলিম্পিকের পরেই এশিয়ান গেমসের মর্যাদা। পৃথিবীর অর্ধেক লোক

চেন কুটিং : জিমন্যাসটিক্সে চিনের 'বিস্ময়বালিকা'

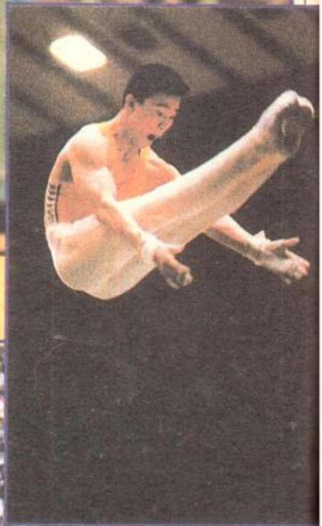

চিনের অন্যতম সেরা জিমন্যাসট লি জিং

ভারতীয় হকি দলের সামনে শক্ত চ্যালেঞ্জ

থাকেন এশিয়ায়। অর্থাৎ, এশিয়ান গেমসে যোগ দেন বহু মানুষ। এত লোকের সমাবেশ যে,প্রতিযোগিতায় তার মর্যাদা ওলিম্পিকের পরেই হওয়া স্বাভাবিক। ওলিম্পিক ও এশিয়াড, দুটি গেমসেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীর শান্তি ও মৈত্রী। ওলিম্পিকের লক্ষ্য : 'সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফরটিয়াস।' অর্থাৎ আরও গতি, আরও উন্নতি ও আরও শক্তির পরিচয় দাও। এশিয়ান গেমসের লক্ষ্য : 'এভার অনওয়ার্ড,'—এগিয়ে চলো। ওলিম্পিকের শ্বেত পতাকায় পাঁচ মহাদেশের প্রতীক পাঁচটি বলয় একত্রে গ্রথিত। এশিয়ান গেমসের শ্বেত পতাকায় একত্রে মালার আকারে গাঁথা ৩৯টি সদস্য-দেশের প্রতীক ৩৯টি ছোট বলয়। তার ওপরে খোদাই করা 'এভার অনওয়ার্ড,' কথাটি,মাঝখানে শক্তির প্রতীক সূর্যচিহ্ন। এই শক্তির লড়াই এবারে দেখা যাবে বেজিংয়ে। বেজিং এশিয়াডে মোট খেলার সংখ্যা ২৭।'৮৬-এর সোল এশিয়াতে হয়েছিল ২৫ রকমের খেলা, আর তার আগে '৮২-র দিল্লির এশিয়ান গেমসে হয়েছিল ২২ রকমের খেলা। এবারের গেমসে-যে পাঁচ ধরনের নতুন খেলা থাকছে তা হল—ক্যানোইং (পুরুষ ও মেয়ে), সফটবল (মেয়ে), উসু (পুরুষ ও মেয়ে) সেপাক টাকরো ও

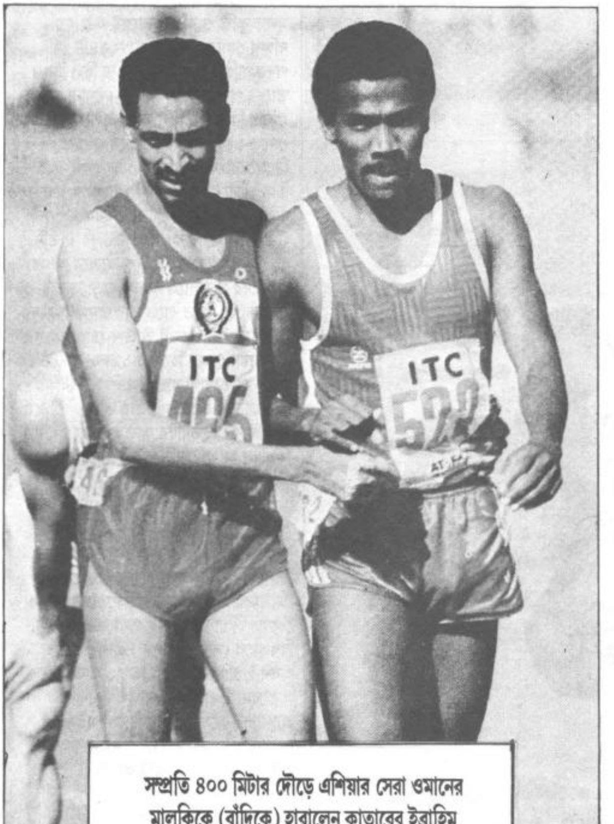

সম্প্রতি ৪০০ মিটার দৌড়ে এশিয়ার সেরা ওমানের মালকিকে (বাঁদিকে) হারালেন কাতারের ইব্রাহিম ইসমাইল (ডানদিকে)। এইরকম অঘটন তিনি কি বেজিং-এও ঘটাবেন ?

এশিয়াড ক্রীড়াসূচি

তীরন্দাজি □ ১-৫ অক্টোবর
অ্যাথলেটিক্স □ ২৭ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর
ব্যাডমিন্টন □ ২৮ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর
বাস্কেটবল □ ২৩ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর
বক্সিং □ ২৫ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর
ক্যানোইং □ ২-৫ অক্টোবর
সাইক্লিং □ ২৪ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর
ফেন্সিং □ ২৪ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর
ফুটবল □ ২৩ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর
গলফ □ ২৩-৩০ সেপ্টেম্বর
জিমন্যাসটিক্স □ ২৩-২৬ সেপ্টেম্বর
হ্যান্ডবল □ ২৪ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর
হকি □ ২৩ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর
জুডো □ ২৮ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর
কবাডি □ ২৫ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর
রোয়িং □ ২৩-২৬ সেপ্টেম্বর
সেপাক টাকরো □ ২৩ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর
শুটিং □ ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর
সফটবল □ ২২-৩০ সেপ্টেম্বর
সাঁতার □ ২৩-২৭ সেপ্টেম্বর
ডাইভিং □ ১-৬ অক্টোবর
ওয়াটারপোলো □ ২৪ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর
টেবিল টেনিস □২৪ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর
টেনিস □ ২৪ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর
ভলিবল □ ২ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর
ভারোত্তোলন □ ২৩ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর
কুস্তি □ ২৩-২৬ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর
উসু □ ২৯ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর
ইয়টিং □ ২২-৩০ সেপ্টেম্বর

ডেমনস্ট্রেশন গেমস :
বেসবল □ ৩-৫ অক্টোবর
সফ্‌ট টেনিস □ ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর

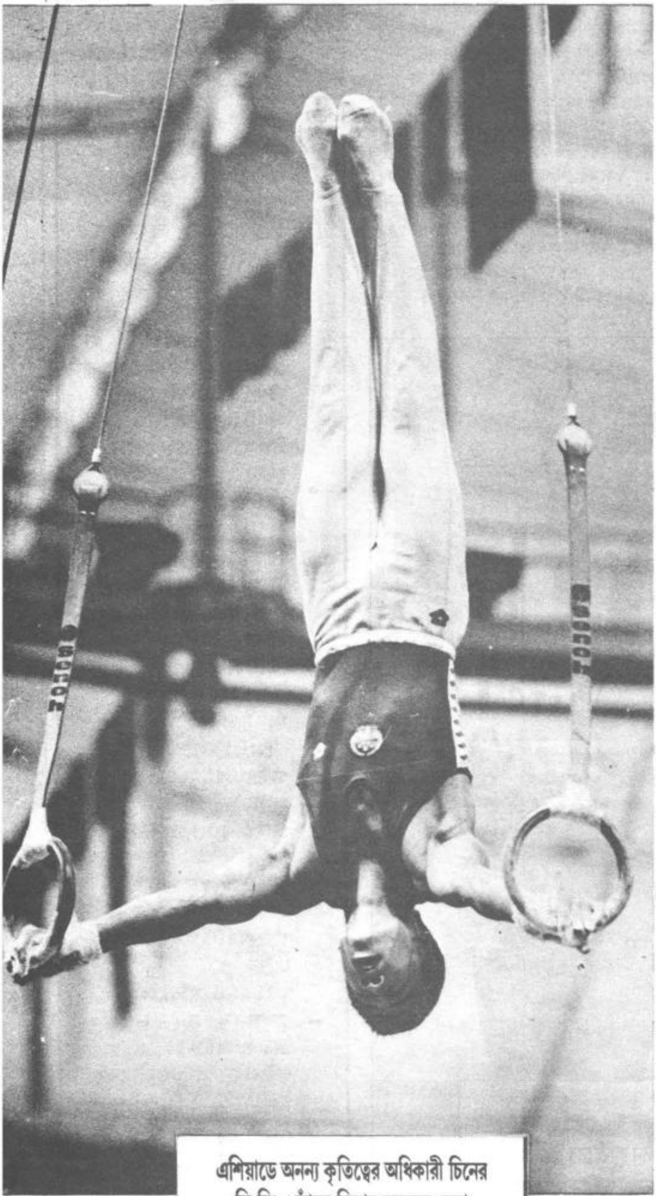

এশিয়াডে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী চিনের লি নিং। তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা জিমন্যাস্ট বলা হয়।

কবাডি। প্রদর্শনী খেলা হিসেবে রাখা হয়েছে বেসবল ও সফট টেনিসকে। এবারের এশিয়াডে অংশ নেওয়ার জন্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন হাজার-পাঁচেক প্রতিযোগী। সঙ্গে অসংখ্য কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। এঁদের মধ্যে থাকছেন ওলিম্পিক সংস্থার প্রধান স্বয়ং জো হ্যাভেলঞ্জ। এবারের এশিয়াডে লড়াই যে জমবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গতবারের সোল এশিয়ান গেমসে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া দল। কিন্তু অনেকের মতে, ওই পদকগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল কোরিয়ার প্রতিযোগীদের। এই অভিযোগ মূলত কুস্তি ও বক্সিং সম্বন্ধেই করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া পদক পায় ২২৪টি। পদকপ্রাপ্তির দিক দিয়ে দ্বিতীয় ছিল চিন। তাদের পদকসংখ্যা ২২২টি। সোনা জয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু চিন ছিল সবার ওপরে। চিন জেতে ৯৪টি সোনা। এবারে যেহেতু নিজেদের দেশে প্রতিযোগিতা হচ্ছে, তাই চিনা প্রতিযোগীরা পদকসংখ্যা আরও বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিনের ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা উয়ান ইউমিনের কথায় তারই সুর। তিনি বলেছেন, "আয়োজক দেশ হিসেবে আমরা আমাদের সাফল্যকে আরও বাড়াতে চাই। পদকসংখ্যা যাতে বাড়ে তার জন্য আমাদের খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করবে।" এই চেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে ১৯৮৮-র নভেম্বর থেকে প্রতিযোগী বাছাই, প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাঁদের পাঠিয়ে পরীক্ষা করা ইত্যাদির কাজ শুরু হয়ে যায়। কিছুদিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে এক দল প্রতিযোগী উন্নত মানের ট্রেনিংও নিয়ে এসেছেন। পর পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বেশ ভাল ফল করেছেন চিনারা। গত অক্টোবরেই বার্সিলোনায় বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিকসে মেয়েদের শটপাটে সোনা জিতেছেন চিনের হোয়াং ঝিয়াং। তিনিই প্রথম এশীয় যিনি বিশ্বকাপে সোনা পেলেন। এশিয়াড দলে অবশ্যই চব্বিশ বছরের ঝিয়াং থাকবেন। থাকবেন ঝিয়াংয়ের সতীর্থ বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিকসে ব্রোঞ্জ জয়ী লি মেইসুও। মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোতে নজর কাড়বেন বার্সিলোনাতে রুপো জয়ী ঝাং লি। জিমন্যাসটিকে চেন কুইটিং এবং কিশোরী ইয়াং বো, ফেন দি চিনের মস্ত ভরসা। চেন কুইটিং গত এশিয়ান গেমসে সোনা পেয়েছিলেন ৩টি—অলরাউন্ড, ফ্লোর

এক্সারসাইজ এবং দলগত ইভেন্টে। চিনের পুরুষ ফুটবল দলের মতো মহিলা দলও এবার বেশ শক্তিশালী। অর্থাৎ প্রায় সব বিভাগেই চিন এবার অন্যান্যদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেবে। এশিয়ান মানে যে চিন এক নম্বর,তা নিজেদের দেশে প্রমাণ করার সুযোগ ছাড়তে নারাজ চিনা খেলোয়াড়রা। দক্ষিণ কোরিয়া সোল এশিয়াড এবং সোল ওলিম্পিকের পর থেকেই খেলাধুলোয় এখন অনেক এগিয়ে আছে। ওলিম্পিকে তারা বিশ্বের সেরা প্রতিযোগীদের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে লড়াই করেছে, জয় ছিনিয়ে এনেছে। লড়াকু দেশ হিসেবে ইতিমধ্যেই নাম কিনেছে দক্ষিণ কোরিয়া। গত এশিয়াডে কোরিয়া সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল। এবার সে অভিযোগ যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোরিয়ার খেলোয়াড়রা। তাঁরা

এবারের এশিয়াডে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বেন জাপানের খেলোয়াড়রা

প্যানপ্যান ও চিনের প্রাচীর

চিনের রাজধানী বেজিং-এর সর্বত্র এখন দেখা যাচ্ছে এশিয়াডের ম্যাসকট 'প্যানপ্যান' এবং প্রতীকচিহ্ন 'প্রাচীর ও সূর্য'। প্যানপ্যান তো ছোটদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতীকচিহ্নটি তৈরি করেছেন ঝু জিয়ান। পেশায় স্থাপত্যশিল্পের শিক্ষক। কাজ করেন সাংহাই টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বছর পাঁচেক আগে বেজিং এশিয়াডের সংগঠন কমিটি ম্যাসকট এবং প্রতীক তৈরির জন্য দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান। কাজটি খুব সহজ ছিল না। কারণ তাতে একদিকে দেখাতে হবে চিনের প্রাচীন সংস্কৃতিকে, অন্যদিকে এশিয়াডের যে মূল লক্ষ্য ঐক্য, বন্ধুত্ব এবং অগ্রগতি—তাও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ঝু জিয়ান এবং তাঁর প্রতীকচিহ্ন

৫০ বছরের ঝু জিয়ান খেলার জগতেরই লোক। দীর্ঘদিন তিনি যুক্ত ছিলেন সাংহাই স্পোর্টস কমিশনের সঙ্গে। পঞ্চম বিশ্বকাপ স্পোর্টস অ্যাক্রোব্যাটিকস প্রতিযোগিতার (১৯৮৫) প্রতীকচিহ্ন 'দ্য ওলিম্পিক স্পিরিট' তাঁরই আঁকা। এশিয়াডের জন্য ১২টি ছবি আঁকেন তিনি। এর বেশিরভাগ তাঁর নিজেরই পছন্দ হচ্ছিল না। নির্বাচিত প্রতীকটি তাঁর ব্যক্তিগত বাছাই হিসেবে ছিল দ্বিতীয়। প্রথম যে প্রতীকটি তিনি এঁকেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'এ ভয়েজ অব ফ্রেণ্ডশিপ'। পরে তিনি চিন্তাভাবনা করে দ্বিতীয় বাছাই প্রতীকটি কমিটির কাছে পাঠান এবং সেটাই নির্বাচিত হয়।

প্রতীকটি দেখতে ইংরেজি 'এ' অক্ষরের মতো। অর্থাৎ এশিয়া। আবার অন্যভাবে রোমান ১১ (একাদশ এশিয়ান গেমস)। প্রাচীরটি দিয়ে চিনের স্বাধীনতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতীকের সূর্য শান্তি ও শক্তির প্রতীক।

বসেও নেই। ৩০০ প্রতিযোগী নিয়ে তাইদং নদীর তীরে প্রশিক্ষণ শিবিরে কয়েক মাস ধরে চলেছে কঠোর অনুশীলন—কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, টেবল টেনিস, ফুটবলে

এমনিতেই শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া দল। এবার বিভিন্ন বিভাগেও যাতে তারা সোনা নিয়ে ফিরতে পারে সেজন্য দলটি তৈরি। ৪০০ মিটার হার্ডলসে হোয়াং হং চুল এবং হাইজাম্পে চো-হুয়ান-উক-এর এবারের এশিয়াডে পদক পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। দু'জনেই গত নভেম্বরে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে সোনা পেয়েছিলেন। স্বর্ণসম্ভাবনা আরও অনেকের আছে, বিশেষত অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন ইভেন্টে।

প্রথম থেকে শুরু করে পর পর কয়েকটি এশিয়ান গেমসে জাপানের একাধিপত্য ছিল। হিসেব করলে দেখা যাবে জাপান দশটি এশিয়াড থেকে প্রায় পাঁচশোর বেশি সোনা নিয়ে গেছে। দিল্লি এশিয়ান গেমস থেকেই কিন্তু জাপান পিছু হটতে থাকে। চিনের আবির্ভাব তাদের বিপাকে ফেলে দেয়। জাপানের একাধিপত্য খর্ব হয়ে যায়। দিল্লির পর সোল এশিয়াডেও জাপান আর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পায়নি। এবার কি তারা পারবে? বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাপানের খেলোয়াড়দের ফলাফল দেখে মনে হয় সম্ভাবনা কম। তবে জাপান যে কয়েকটি ইভেন্টে চিন ও কোরিয়াকে প্রবল বেগ দেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জাপানের সাঁতারুরা এশিয়া-সেরা হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। ২০০ মিটার দৌড়ে জাপানের

বনি মিক্স ®

নিমেষে তৈরীর পরিজ।

শস্যদানা, ফলমূল আর কাজুবাদামের পুষ্টিগুণে ভরপুর আহার।

বনি মিক্স –
গম, ভুট্টা, চাল, আম,
আপেল, খেজুর, কিশমিশ আর
কাজুবাদামের খাদ্যগুণে ভরা
স্বাস্থ্যকর এক
সম্পূর্ণ আহার।

সবারই তরে,
উত্তম
স্বাদে-গুণে ভরা

বনি মিক্স হল পুষ্টিকর এক পরিজ খাবার, যা সারা পরিবারের জন্যেই উত্তম আর খেতেও চমৎকার। প্রাতরাশে বা স্কুল বা অফিসের সারাদিনের ক্লান্তির পর শরীর-মন চাঙ্গা করতে এক উত্তম ও উপাদেয় আহার। অতি সহজেই হজম হয় বলে এটি বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে আর স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্যেও এক আদর্শ খাদ্য।

কয়েক মিনিটেই তৈরী

বনি মিক্স এত চট্‌পট্‌ আর সহজেই তৈরী হয় বলে আজকের ব্যস্ত গৃহিণীদের জন্যে এক বরদান স্বরূপ বলা চলে। আপনাকে শুধু করতে হবে কি :

একটা কাঁচের বাটিতে প্রয়োজনমত বনি মিক্স ঢালুন।

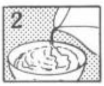

অল্প অল্প করে যথেষ্ট পরিমাণ আগে থেকে ফোটানো দুধ মেশান।

আলতো নেড়ে-নেড়ে মিহি ক্রীমওলা মালাইয়ের মত পরিজ বানান।

দেখবেন, আপনার পরিবারের সকলে আহ্লাদে চেটেপুটে খাবে চামচ ভরে-ভরে।

হ্যাঁ, আপনার পরিবারের সবারই জন্যে স্বাদ ও পুষ্টির আশ্চর্য সমন্বয়গুণে ভরা এক নতুন জগতের আশ্চর্য খাবার দিন এনে। ওদের নিয়মিত দিন – বনি মিক্স!

বনি মিক্স ®

ভারতে এই সর্বপ্রথম!

গ্ল্যাক্সো – সুস্বাস্থ্যের উৎস!

GL/2/88-R-BEN

ওকুয়ামা এশিয়া-সেরা। তিনি কি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারবেন ? বেজিংয়ে তা হলে কিন্তু সময় আরও কমাতে হবে। তা না হলে চিন ও বাহরিনের খেলোয়াড়রা তাঁকে পেছনে ফেলে চলে যাবেন। হাই জাম্পে চো-হুয়ান-উক এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে সোনা পেয়েছিলেন। এবারের এশিয়াডে চিনের লিউ ইয়ান পেং তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার জাপানকে ভাল কিছু করার জন্য প্রায় সব বিভাগেই এরকম লড়াইয়ের মধ্যে পড়তে হবে। একাধিপত্যের দিন শেষ। জাপান কী করে, তা দেখার জন্য আমরা সকলেই উন্মুখ হয়ে বসে আছি। অন্তত একটা জমজমাট লড়াই যে জাপানের প্রতিযোগীদের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাব, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখিয়ে চমকে দিতে পারে, যাদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, সেইসব দেশের প্রতিযোগীরা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে কাতারের খেলোয়াড়রা। 'জায়ান্ট কিলার' বা 'মহীরুহ পতন'-এ তাঁদের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি এ· টি· এফ· প্রতিযোগিতায় এরকমই একটি অঘটন ঘটালেন কাতারের ইব্রাহিম ইসমাইল। ৪০০ মিটার দৌড়ে এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ওমানের মহম্মদ আমের আল মালকি। তিনি 'ওমানিস এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত। বিশ্বসেরা ড্যানি এভার্ট এবং বুচ রেনল্‌স-এর পরেই নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি কিছুদিন আগে। সেই এক্সপ্রেসকে লাইনচ্যুত করলেন ইসমাইল। প্রথম ২০০ মিটারে মালকির ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি ইসমাইল। শেষ ৪০ মিটারে হঠাৎই উড়ে এসে এশিয়ান রেকর্ডধারী মালকিকে পেছনে ফেলে দিলেন তিনি। চাইনিজ-তাইপের লি ফু অ্যান এরকমই আর-একজন প্রতিযোগী। ডেকাথলনের অবিসংবাদী চ্যাম্পিয়ান গং গুওহুয়াকে এবারের এশিয়াডে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেবেন তিনি। ইরানের ফারামার্জ রৌসতাইফার ৮০০ মিটার দৌড়ে জাপানের তাচিকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন। আমাদের প্রতিযোগীরা কী করবেন ? অধিকাংশ প্রতিযোগী যোগ্যতামানই পেরোতে পারেননি, তা সত্ত্বেও প্রায় ২০০ জন খেলোয়াড় বেজিং যাচ্ছেন। শুধুমাত্র ৪ × ৪০০ মিটার রিলে রেসে যোগ্যতামান দেখাতে পারলেও পি· টি· উষা কিন্তু বেজিংয়ে অংশ নেবেন ১০০, ২০০, ৪০০ মিটার দৌড়ে, ৪০০ মিটার হার্ডলসে এবং ৪ × ১০০

ভোজন সমাচার

বেজিং এশিয়াডকে স্মরণীয় করে রাখতে কর্তৃপক্ষ সবদিক দিয়েই চেষ্টা চালাচ্ছেন। খাবারের দিকটাও তাঁদের নজর এড়ায়নি। এশিয়াড উপলক্ষে হাজার-হাজার পর্যটক, প্রতিযোগী, সাংবাদিক, কর্মকর্তা চিনে যাবেন। অতিথিদের জন্য খাদ্যের যে তালিকাটি তাঁরা প্রকাশ করেছেন, তা এশিয়াডে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ। সংখ্যাটা অনুমান করা যাচ্ছে ? মনে হয় না যাবে—চারশো রকমের খাবারের ব্যবস্থা থাকছে এবার। গত এশিয়াডের ঠিক দ্বিগুণ আয়োজন। ১২টি শ্রেণীতে খাদ্য তালিকা ভাগ করা হয়েছে। যেমন, গরম খাদ্য, ঠাণ্ডা খাদ্য, স্টেপল্‌স, পেস্ট্রি, সুপ, তরল খাদ্য, পিকল্‌স, গরম ও ঠাণ্ডা পানীয়, ফলমূল। চাইনিজ, মুসলিম ও পাশ্চাত্য খাদ্য, নিজেই নিয়ে খেতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকছে। তা ছাড়া, প্রতি সপ্তাহেই খাদ্য তালিকা বদলে দেওয়া হবে। যাতে মুখে অরুচি না আসে!

ছবি : দেবাশিস দেব

গত দুটি ওলিম্পিকের খাদ্য তালিকা খুব ভালমতো পরীক্ষা করা হয়েছে। যাতে প্রতিযোগীদের পুষ্টিকর খাদ্যের অসুবিধা না হয় তার দিকে কর্তৃপক্ষ নজর রেখেছেন। প্রতিযোগীদের প্রতিদিনের খাদ্যে যাতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, জৈব লবণ ও পুষ্টিগুণ থাকে এবং কমপক্ষে ছ' হাজার ক্যালরির হয়, সেদিকে বিশেষজ্ঞরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। সুস্বাদু খাদ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে ফরাসি ফিলেট, প্যালেস্তাইনের চিকেন, ভারতীয় মটন এবং ইতালীয় স্প্যাগেটি। এর সঙ্গে থাকছে একটি দুর্দান্ত মুখরোচক চিনে খাবার—ঝলসানো পাতিহাঁসের মাংস। এই মাংস পাতলা করে কেটে তার সঙ্গে প্যানকেক ও পেঁয়াজ মিশিয়ে সয়াবিন থেকে তৈরি ঘন মিষ্টি আচার মাখিয়ে ভোজনবিলাসীদের পরিবেশন করা হয়। এটি এখনকার খাবার নয়। গত ছ' থেকে সাতশো বছরের পুরনো। চিনের প্রাচীর না দেখলে যেমন চিনে যাওয়া নিরর্থক, তেমনই এই খাবারটি না খেলে চিন সফর ব্যর্থ বলে মনে করেন অনেকে।

নিজেদের দেশের মাটিতে 'সেরা' হওয়ার চেষ্টা করবেন চিনের খেলোয়াড়রা

গ্ল্যাক্টো এখন একই রকম সাশ্রয়কর দামে যে কোনও দোকানে

৫০০ গ্রাম ৩৫ টাকা
১ কিলো ৬৫ টাকা

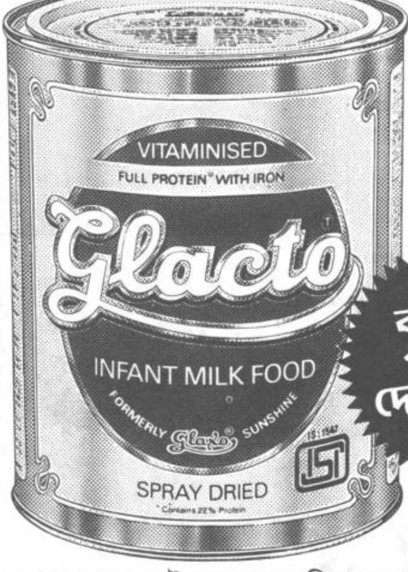

গ্ল্যাক্টো এখন একই সমান দামে দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। এই দাম সব কর সমেত।

জরুরী বিষয়ঃ বাচ্চার জন্যে মায়ের দুধ সবচেয়ে ভালো।

বাড়তি পয়সা দেবেন না!

গ্রাহকদের জানাবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হল!
সব কর সমেত সর্বত্র সমান দাম।

Gx.281.90 Bn

ও ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে। উষা কি এবারে সফল হবেন ? সে প্রশ্ন আপাতত অবান্তর, কারণ সমালোচনা আমরা যতই করি না কেন, এখনও কেরলের এই শ্যামলা মেয়েটিই আমাদের প্রধান ভরসা।
এশিয়াডের পরই ট্র্যাককে বিদায় জানাবেন উষা। শেষবারের মতো যদি জ্বলে ওঠেন তবেই ভারত সোনার আশা করতে পারে। ১৫০০ মিটার দৌড়ে বাহাদুর প্রসাদ সোনা পেতে পারেন। তাঁর সময় এখন এশিয়া-সেরা। ভারতের তিন তীরন্দাজ লিম্বারাম, শ্যামলাল ও কালজাং দোরজিও এশিয়া-সেরা। সুতরাং সোনার পদক এঁদের কাছেও আশা করা যেতে পারে। পদক পাওয়া যেতে পারে ভারতের শটপাটার এস· ডি· এশান বলবিন্দর বা বাহাদুর সিং-এর কাছ থেকেও। হকিতে ভারত পদক পেলেও পেতে পারে, তবে প্রাক্তন ওলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং-এর মতে, "এখন শুধু পাকিস্তানই নয়, দক্ষিণ কোরিয়াও ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং কী হবে বলা মুশকিল।"
স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া এশিয়াডের লক্ষ্যে দেড় বছর আগে 'অপারেশন এক্সেলেন্স' বলে একটি উদ্যোগ নেন। যে বারোটি খেলায় ভারতের পদক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই খেলাগুলোকে বাছা হয়েছিল এই অভিযানে। এর জন্য সাই খরচ করেছে ৩·০৫ কোটি টাকা, যেমন, অ্যাথলেটিকসে খরচ হয়েছে ৭৩ লক্ষ টাকা, বক্সিং-এ ৩৭·২৫ লক্ষ, রোয়িং-এ ১৯·৫৩ লক্ষ, পুরুষ হকিতে ৩৪·৪৩ লক্ষ টাকা ইত্যাদি। এই উদ্যোগ নাকি 'দারুণ সফল' হয়েছে! কারণ অনেক প্রতিযোগীই এবার এশিয়াডের যোগ্যতামান পেরিয়েছেন! এতেই সাই খুব খুশি।
এক সাংবাদিক একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। তাঁকে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, বিদেশ থেকে কোচ এনে এবং এত টাকা খরচ করে কী হবে ? বরং অতি সহজেই ভারত অনেক বেশি পদক পেতে পারে একটা কাজ করলে। কী সেই কাজ ? ভারতের 'অতি যোগ্য' কর্মকর্তাদের একটি দলকে যদি চিন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো হয় তবে ওদের মান টপাটপ নীচে নেমে যাবে। আমরাও অতি সহজে পদক পেয়ে যাব। গল্পটি মজার, কিন্তু অতি দুঃখের।
প্রকৃতপক্ষে দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের ভালর চিন্তা যতদিন না কর্মকর্তারা করবেন, ততদিন ভারতকে ওই মাত্র কয়েকটি পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
এবারে বেজিংয়ে ৮১০টি সোনার পদক তৈরি করে রাখা হয়েছে। ইভেন্ট-সংখ্যা কম থাকলেও দলগত খেলায় বিজয়ীদেরও এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা ঝাও রসিকতা করে বলেছেন, "আমরা সোনার ছড়াছড়ি করে দিয়েছি এবার।" এই ছড়ানো সোনায় কারা এখন ভাগ বসাবেন, সেটাই দেখার।

বিশিষ্ট অতিথি

ইয়ান হ্যাক্সিয়া

এবারের এশিয়াডে বিশিষ্ট অতিথিদের মাঝে পঞ্চদশী এক কিশোরীকেও বসে থাকতে দেখা যাবে। কিশোরীটির নাম ইয়ান হ্যাক্সিয়া, বাড়ি পূর্ব চিনের ঝিয়াংসু প্রদেশের ঝিয়াংতুতে। ইয়ান এখন চিনে খুব পরিচিত নাম। কেন ?
১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে বারো বছরের ইয়ান, তার হাত খরচের অর্থ বাঁচিয়ে এশিয়ান গেমস সংগঠন কমিটির সহসভাপতি ঝ্যাংবাইফাকে ১·৬০ ইয়েন (চিনের মুদ্রার নাম) পাঠায়। অর্থটা সামান্য, কিন্তু ইয়ানই প্রথম গেমসকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী ইয়েন স্থানীয় খবরের কাগজে বেজিং এশিয়াডের প্রস্তুতির কথা জানতে পারে। জানতে পারে, এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে সে তার নিজের দেশকে সাহায্য করবে ? বসন্তোৎসবে খরচের জন্য বাবার কাছ থেকে দু' ইয়েন পেয়েছিল ইয়ান। তার মধ্যে ০·৪০ ইয়েন খরচ হয়েছে একটি খাতা কিনতে। হাতে রয়েছে ১·৬০ ইয়েন। এই বাকি অর্থই তো সে কমিটিকে পাঠিয়ে দিতে পারে! ভেবে নিয়ে একটি খামে করে সে তা পাঠিয়ে দেয় ঝ্যাংবাইফা-র নামে। সঙ্গে একটি চিঠিতে লেখে, এশিয়ান গেমস ভালভাবে সম্পন্ন হোক, শুভেচ্ছা রইল।
কৃতজ্ঞচিত্তে তার শুভেচ্ছা এবং অর্থ গ্রহণ করেছে গেমস কমিটি। নিজের চোখে এশিয়াড দেখার আমন্ত্রণও তাকে জানানো হয়। ইয়ান খুব খুশি।

শটপাটে সোনা অবশ্যই পাবেন চিনের হোয়াং ঝিহোং। কিছুদিন আগেই তিনি বিশ্বকাপে জিতেছেন।

প্রথম থেকে দশম এশিয়াড

ওলিম্পিকের ধরনে এশিয়ায় একটি প্রতিযোগিতার চিন্তাভাবনা প্রথম করেন প্রোফেসর জি· ডি· সোঁধি। ১৯৩৪ সালে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়েস্ট এশিয়াটিক গেমস। ভারত সহ চারটি দেশ এতে যোগ দেয়। এর পর প্রোফেসর সোঁধির অক্লান্ত চেষ্টা ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর আনুকূল্যে অবশেষে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রথমটি হয় ভারতেই। শুরু থেকে দশটি এশিয়াড়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন **তমাল রায়**

এশিয়াডের অন্যতম রূপকার গুরুদত্ত সোঁধি

প্রথম এশিয়াড : ১৯৫১

তারিখটি ছিল ৪ মার্চ, ১৯৫১। ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। চল্লিশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ওইদিন প্রথম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। অফগানিস্তান, বর্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড এবং ভারত সমেত মোট এগারোটি দেশের ৬০০ প্রতিযোগী প্রথম এশিয়াডে অংশ নেন। ১৯২৪ এবং ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ব্রিগেডিয়ার দিলীপ সিং এশিয়ান গেমসের প্রথম মশাল বাহকের সম্মান পান।

আট দিনের প্রতিযোগিতায়, ছ'টি খেলায় ৫৫টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ছ'টি খেলা হল—অ্যাথলেটিকস, বাস্কেটবল, সাইক্লিং, ফুটবল, সাঁতার এবং ভারোত্তোলন। জাপান ২৪টি সোনা পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, ১৬টি সোনা জিতে ভারত দ্বিতীয় হয়। জাপানের ২৪টি সোনার মধ্যে ২০টিই আসে অ্যাথলেটিকস থেকে, ১১টি পুরুষ এবং ৯টি মহিলাদের পদক। জাপান কিন্তু সাঁতারে একটিও পদক জিততে পারেনি। ভারতের লেভি পিন্টো এশিয়ার দ্রুততম পুরুষের সম্মান পান, ১০০ মিটার দৌড়ে তাঁর সময় হয় ১০·৮ সেকেন্ড। ভারত ফুটবলে এশিয়া-সেরা হয় ইরানকে হারিয়ে। গর্বের কথা, এমন কোনও ইভেন্ট ছিল না যাতে ভারত কোনও পদক পায়নি। ভারোত্তোলনের সাতটি সোনাই যায় ইরানের দখলে। ইরানের এম· নামদু ব্যান্টমওয়েট বিভাগে ৭০০ কেজি ওজন তুলে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন। উদ্বোধনের মতোই সমাপ্তি অনুষ্ঠানও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে সম্পর্ক এত ভাল হয়ে যায় যে, মার্চপাস্টে বর্ণমালা অনুযায়ী পর পর আসার নিয়ম কেউ মানেননি, সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে থাকেন।

প্রথম এশিয়াডের উদ্বোধনী আসরে

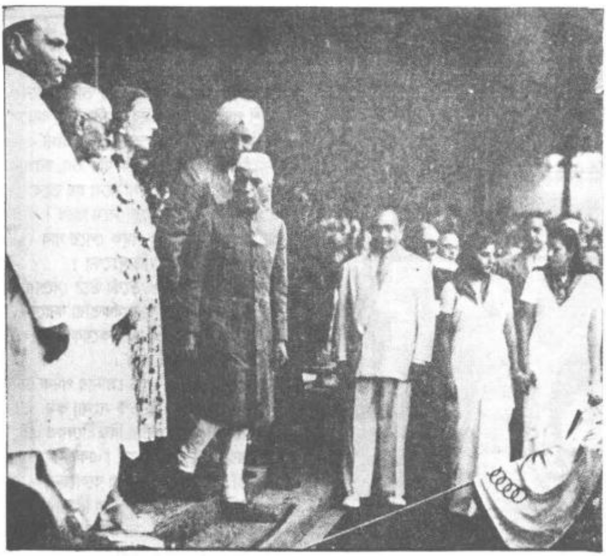

দ্বিতীয় এশিয়াড : ১৯৫৪

ফিলিপিনসের রাজধানী ম্যানিলায় দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস হয়। আঠারোটি দেশ থেকে ১০২১ জন প্রতিযোগী অংশ নিতে আসেন। ৮টি খেলায় ইভেন্টের সংখ্যা ছিল ৭৭। কুস্তি, বক্সিং এবং শুটিং প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। নেপাল এবং ইরান এবারে যোগ দেয়নি, বদলে ন'টি নতুন দেশ আসে : হংকং, ইজরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, উত্তর বোর্নিও, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া এবং তাইওয়ান।

৩৮টি সোনা পেয়ে জাপান আবার শীর্ষস্থান

দখল করে। ভারত দ্বিতীয় স্থান হারিয়ে চতুর্থতে নেমে যায়। ফিলিপিনস দ্বিতীয় হয়। ন'টি দেশ একটিও সোনা পায়নি। এই গেমসেই একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তাইওয়ানের পি লিং ১০ হাজার মিটার দৌড়ের সময় হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেন। তখন আর বাকি ছিল মাত্র ৪০০ মিটার এবং তিনি প্রথমে যাচ্ছিলেন। লিং কষ্ট সহ্য করেই না থেমে দৌড় শেষ করেন কিন্তু তাঁকে জীবন হারাতে হয়।

তৃতীয় এশিয়াড : ১৯৫৮

কুড়িটি দেশের ১৪০০ প্রতিযোগীর উপস্থিতিতে জাপানের রাজধানী টোকিওতে শুরু হয় তৃতীয় এশিয়াড। ১৩টি খেলায় ছিল ১১১টি ইভেন্ট। নেপাল এবং ইরান আবার যোগ দেয়। হকি, লন টেনিস, টেবল টেনিস, সাইক্লিং এবং ভলিবল—এই পাঁচটি নতুন খেলা এবারে শুরু হয়।

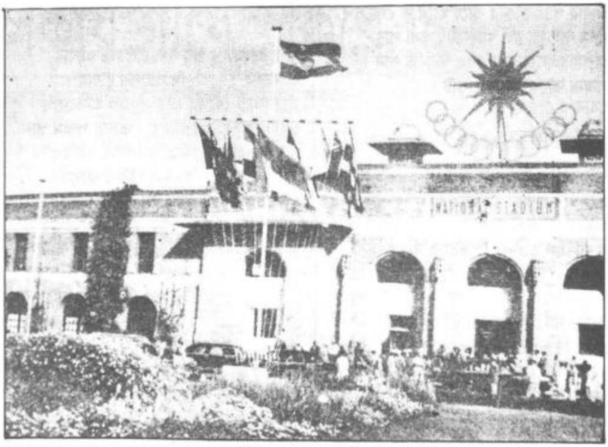

প্রথম এশিয়ান গেমসের আসর বসেছিল নয়াদিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে

জাপান আবার প্রথম স্থান পায়, ৬৭টি সোনা পেয়ে। দ্বিতীয় স্থান ফিলিপিনসের। তাদের সোনার সংখ্যা মাত্র ৭। এতেই বোঝা যায় জাপানের আধিপত্য কতখানি ছিল।
৫টি সোনা পেয়ে ভারতের স্থান হয় সপ্তম। ভারতের মিলখা সিং ২০০ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা পান এবং দুটিতেই নতুন রেকর্ড গড়েন। ২০০ মিটারে তাঁর সময় ২১·৬ সেকেন্ড, ৪০০ মিটারে ৪৭·০ সেকেন্ড। বিশ্ব হকিতে ভারতের তিরিশ বছরের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়। সোনা পায় পাকিস্তান। ফাইনালে যদিও খেলা গোলশূন্য থাকে, তবুও টুর্নামেন্টে গোল বেশি করায় পাকিস্তানই জেতে।

চতুর্থ এশিয়াড : ১৯৬২

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্তায় চতুর্থ এশিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িটি দেশের ১৫০০ প্রতিযোগী ১৩টি খেলায় অংশ নেন। এক লক্ষ দর্শক বসার মূল স্টেডিয়ামটি এই এশিয়াডের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। আগের তিনটি এশিয়ান গেমসের মতোই জাপান এবারও পদকতালিকায় প্রথম থাকে, ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় এবং ভারত তৃতীয় স্থান পায়। ভারতের সংগ্রহে আসে ১১টি সোনা, ১৩টি রুপো এবং ১০টি ব্রোঞ্জ। ভারতীয় কুস্তিগিররা ১২টি পদক পান। ত্রিলোক সিং ১০ হাজার মিটারে, মহিন্দর সিং ১৫০০ মিটারে এবং মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা পান। দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ভারত ফুটবলে সোনা পায় কিন্তু হকিতে

বিগত এশিয়াডের পদকতালিকা

	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
চিন	৯৪	৮২	৪৬	২২২
দঃ কোরিয়া	৯৩	৫৫	৭৬	২২৪
জাপান	৫৮	৭৬	৭৭	২১১
ইরান	৬	৬	১০	২২
ভারত	৫	৯	২৩	৩৭
ফিলিপিনস	৪	৫	৯	১৮
তাইল্যান্ড	৩	১০	১৩	২৬
পাকিস্তান	২	৩	৪	৯
ইন্দোনেশিয়া	১	৫	১৪	২০
হংকং	১	১	৩	৫
কাতার	১	০	৩	৪
লেবানন	১	০	১	২
বাহরিন	১	০	১	২
মালয়েশিয়া	০	৫	৫	১০
ইরাক	০	৫	২	৭
জর্ডন	০	৩	১	৪
কুয়েত	০	১	৮	৯
সিঙ্গাপুর	০	১	৪	৫
সৌদি আরব	০	১	০	১
নেপাল	০	০	৮	৮
বাংলাদেশ	০	০	১	১
ওমান	০	০	১	১

আবার পাকিস্তানের কাছে হারে দু' গোলে। পদম বাহাদুর মল বক্সিংয়ে সোনা পান। এশিয়ার সেরা বক্সারেরও স্বীকৃতি পান। এজন্য তাঁকে আরও একটি সোনাও দেওয়া হয়।

পঞ্চম এশিয়াড : ১৯৬৬

তাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে পঞ্চম এশিয়াডের আসর বসে। আঠারোটি দেশ এতে যোগ দেয়, প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১৯৪৫, ইভেন্টের সংখ্যা ছিল ১৪০।

জাপান যথারীতি প্রথম হয় ১৪০টির মধ্যে ৭৮টি সোনা পেয়ে। ভারত পঞ্চম স্থান পায়। ডিসকাসে ৪৯·৬০ মিটার ছুঁড়ে পরভিন কুমার নতুন রেকর্ড করেন। ভারত হকিতে আবার সোনা উদ্ধার করে।

ষষ্ঠ এশিয়াড : ১৯৭০

নানা ঝামেলার পর ষষ্ঠ এশিয়াড আবার ব্যাঙ্ককেই হয়, অর্থাৎ পর পর দু'বার। আঠারোটি দেশের প্রায় ২০০০ প্রতিযোগী ১৩টি খেলায় অংশ নেয়। ভারত পঞ্চম স্থান পায়। পরভিন কুমার ডিসকাসে ৫২·৩২ মিটার ছুঁড়ে আবার নতুন রেকর্ড করেন। ভারতের মহিলা অ্যাথলেট হিসেবে ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা পান কমলজিৎ সাঁধু। ভারত আবার হকিতে হারে, ফুটবলে তৃতীয় স্থান পায়।

সপ্তম এশিয়াড : ১৯৭৪

ইরানের রাজধানী তেহেরানে এবারের আসর বসে। প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ছিল ২৫, প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০। ১৬টি খেলায় ইভেন্ট ছিল ১২২টি। জাপান প্রথম স্থান দখল করে ৭৫টি সোনা পেয়ে। ভারত সপ্তম হয়, পদকের সংখ্যা ২৮। বিজয় সিং চৌহান ডেকাথলনে এবং টি· সি· যোহানন লং জাম্পে নতুন এশীয় রেকর্ড গড়েন। শিবনাথ সিং ৫ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা এবং ১০ হাজার মিটারে রুপো পান।

অষ্টম এশিয়াড : ১৯৭৮

তাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে অষ্টম এশিয়ান গেমস হয়। একুশটি দেশের প্রায় ৩ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেন। ১৯টি খেলায় ইভেন্টের সংখ্যা ছিল ১৮৫টি। জাপান ১৭৮টি পদক দখল করে যথারীতি এক নম্বরে থাকে। ভারত পায় ২৮টি পদক, তার মধ্যে ১১টি সোনা। হকিতে ভারত আবার হারে পাকিস্তানের কাছে। জাপানের জিমন্যাস্ট কিটাগাওয়া এবং চিনের মহিলা টেবল টেনিস খেলোয়াড় চ্যাং লি তিনটি করে সোনা পেয়ে সুপারস্টারের মর্যাদা পান। ভারতের হরি চাঁদ ৫ এবং ১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা পান।

নবম এশিয়াড : ১৯৮২

প্রথম এশিয়াডের পর আবার দিল্লিতে বসে এবারের আসর। বত্রিশটি দেশের ৩ হাজারের ওপর প্রতিযোগী অংশ নেন নবম এশিয়াডে। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন হয়। ভারতের দলটি ছিল সর্ববৃহৎ, ৫২৮ জনের। ভারত এই এশিয়াডেই সবচেয়ে বেশি পদক পায়, মোট ৫৭টি—১৩টি সোনা, ১৯টি রুপো এবং ২৫টি ব্রোঞ্জ। ভারতের চাঁদরাম (২০ কি· মি· হাঁটা), বাহাদুর সিং (শটপাট), এম· ভি· বালসাম্মা (দৌড়) এবং মেয়েদের হকিতে ভারত সোনা পায়।

দশম এশিয়াড : ১৯৮৬

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সোলে এবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ হাজার-এর বেশি প্রতিযোগী ১৬ দিন ধরে এতে অংশ নেন। ভারত পঞ্চম স্থান পায় পাঁচটি সোনা পেয়ে। এর মধ্যে চারটিই সোনার মেয়ে পি· টি· উষার। উষা ২০০, ৪০০ মিটার দৌড়, ৪০০ মিটার হার্ডলস, এবং ৪ × ৪০০ মিটার রিলে রেসে সোনা পান। এ এক অনন্য কৃতিত্ব। চিন তার আধিপত্য বজায় রাখে ৯৪টি সোনা পেয়ে, যদিও পদকপ্রাপ্তিতে প্রথম হয় দক্ষিণ কোরিয়া।

প্রধান তিনটি দেশের পদকতালিকা

মোট পদক জাপান—১৪৬১ দক্ষিণ কোরিয়া—৬১৭ চিন—৬১৫

	চিন			জাপান			দঃ কোরিয়া			ইভেন্ট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা
	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ		
১ম এশিয়াড ১৯৫১ (দিল্লি)	অংশ নেয়নি			২৪	২০	১৬	অংশ নেয়নি			৬	১১
২য় এশিয়াড ১৯৫৪ (ম্যানিলা)	অংশ নেয়নি			৩৭	২৪	২৪	৮	৬	৫	৮	১৮
৩য় এশিয়াড ১৯৫৮ (টোকিও)	অংশ নেয়নি			৬৭	৪১	৩০	৮	৭	১২	১৩	২০
৪র্থ এশিয়াড ১৯৬২ (জাকর্তা)	অংশ নেয়নি			৭৩	৫৫	২৪	৪	৮	১১	১৩	১৬
৫ম এশিয়াড ১৯৬৬ (ব্যাঙ্কক)	অংশ নেয়নি			৭৮	৫৩	৩৩	১২	১৮	২১	১৪	১৮
৬ষ্ঠ এশিয়াড ১৯৭০ (ব্যাঙ্কক)	অংশ নেয়নি			৭৪	৪৭	২৩	১৮	১৩	২৩	১৩	১৮
৭ম এশিয়াড ১৯৭৪ (তেহেরান)	৩৩	২৮	২৮	৭৫	৫০	৫১	১৬	২৬	১৫	১৬	২৫
৮ম এশিয়াড ১৯৭৮ (ব্যাঙ্কক)	৫১	৫৪	৪৬	৭০	৫৯	৪৯	১৮	২০	৩১	১৯	২৫
৯ম এশিয়াড ১৯৮২ (দিল্লি)	৬১	৫১	৪১	৫৭	৫২	৪৪	২৮	২৮	৩৭	২১	৩৩
১০ম এশিয়াড ১৯৮৬ (সোল)	৯৪	৮২	৪৬	৫৮	৭৬	৭৭	৯৩	৫৫	৭৬	২৫	২৭

চিত্রণ : নীলরতন মাইতি

পদক-তালিকায় শীর্ষে থাকবে চিন

এশিয়াড জেতার ক্ষমতা রাখে চিন । লিখেছেন **আশিস সরকার**

একাদশ এশিয়াডের আসর এবার বসছে চিনে । সেজন্য বেজিং সমেত সারা চিন দেশেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে । সেই সঙ্গে চলেছে বিভিন্ন বিভাগের সেরা প্রতিযোগীদের কড়া অনুশীলন । প্রতিযোগিতার ঠিক আগে সব বিষয়ের খুঁটিনাটি জেনে, দোষত্রুটি ঢেকে ট্র্যাকে বা ফিল্ডে নামার জন্য চিনা খেলোয়াড়রা প্রস্তুত । আকর্ষক আর দৃষ্টিনন্দন খেলা জিমন্যাসটিকসে নজর কাড়বার জন্য চিনা পুরুষ ও মহিলা দল অবিরাম অনুশীলন করে চলেছেন । আঠারো বছর বয়সী চেন কুটিং চিনা মহিলা দলের প্রধান স্তম্ভ । চার বছর আগে সোলে চেনকে আমরা যেমন দেখেছিলাম, তার চেয়ে তিনি দারুণ পরিণত এবার । সোলে চেন তিনটে সোনা জিতেছিলেন । ফ্লোর এক্সারসাইজ তাঁর প্রিয় ইভেন্ট আর তিনি এবার তৈরি হচ্ছেন বিখ্যাত পিয়ানো সঙ্গীত 'ইয়ালো রিভার কনটাটা'র তালে-তালে । জিমন্যাসটিকস দলে চেন ছাড়াও আছেন ফান ডি, ইয়াং বো, শি লিইং, ঝান ওয়েনিং ; যাঁরা পদকের লড়াইয়ে কাছাকাছি থাকবেন ।

এদিকে প্রস্তুতিপর্বের আগুনে ঘি ঢেলেছে চায়না কাপ ইন্টারন্যাশনাল জিমন্যাসটিকস টুর্নামেন্ট, যা বেজিং-এ হয়ে গেল এ-বছরের এপ্রিলের শেষের দিকে । অস্ট্রিয়া, কানাডা, কিউবা, ফ্রান্স, রুমানিয়া, ইতালি, হাঙ্গারি, পশ্চিম জার্মানি, জাপান সমেত বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিলেন এতে । এতে চিন পেয়েছে দশটি সোনা । মহিলাদের অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়ান ইয়াং বো-র কথা আগেই বলেছি । তিনি ছাড়া নজর কেড়েছিলেন আইন ইভেন বার-এ ঝান সিয়া । পুরুষ জিমন্যাসটিকস দলও এশিয়াডের আগে চায়না কাপে তাঁদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে । মা ঝেং পেয়েছেন অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়ানের সম্মান আর লি জিং এবং নং কিয়াং সোনা পেলেন যথাক্রমে হরাইজেন্টাল বার আর রিং এবং প্যারালাল বারে । এ ছাড়া ছিল লি সিয়াও সুয়াং নমেল হর্সে । চিনা পুরুষ জিমন্যাসট দল যে এশিয়াডে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাবে এটা তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, আর কড়া অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে শেষ ক'দিনের জন্য ।

চিনা ফুটবল দলের লক্ষ্য এবার এশিয়াডের সোনার দিকে । তাদের কোচ ঘাও ফেনওয়েন জোর দিয়ে বলেছেন, তাঁর দল যে প্রস্তুতি নিয়েছে তা তাদের এশিয়া-সেরা হওয়ার সম্মান এনে দেবে । বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের ফাইনালে শেষ মুহূর্তে ম্যাচটা হাতের মুঠো থেকে না বেরিয়ে গেলে ইউনাইটেড আরব আমিরশাহির বদলে তারাই যেতে পারত এশিয়ার দল হিসেবে বিশ্বকাপে । ঘাও ফেনওয়েন নিজের ঘাড়ে সমস্ত গুরুভার তুলে নিয়ে বলেছেন, এশিয়াডে না জিততে পারলে চিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন । ফুটবল দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বারবার ভিডিও ম্যাচ দেখে ভুল বের করা ছাড়াও উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গিয়েও দু'বার প্র্যাকটিস করিয়েছেন ।

দলগত যে আর-একটি ইভেন্টের আকর্ষণ এবার এশিয়াডে কম নয়, সেটি হল সফ্টবল । বিশেষ করে মহিলা সফ্টবল দলটি চিনের মুখ উজ্জ্বল করবে এটা আশা করা যাচ্ছে । ১৯৮৬ সালে মেয়েদের বিশ্ব সফ্টবল প্রতিযোগিতার শুরুতেই রুপো জেতে চিনা মহিলা দল, নতুন অথচ দক্ষ তরুণীদের নিয়ে গড়া এই দলটির গড় বয়স ২১·৫ বছর আর উচ্চতা ১·৭০ মিটার । লিউ সুকিং-এর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছাড়াও আছেন ইয়ান ফাং এবং ওয়াং ইং । হেড কোচ লি মিনকুয়ান তাঁর দুই সহকারী কোচকে নিয়ে এই দলটিকে হাই গেং ট্রেনিং বেস, ইউনান প্রভিন্স ইত্যাদি জায়গায় কড়া অনুশীলন চালাচ্ছেন গত এক বছর ধরে। এশিয়ার অন্য শক্তিশালী সফ্টবল দলের থেকে দৈহিক শক্তি, গতি আর গড় উচ্চতায় এগিয়ে থাকলেও এই দলকে আরও কৌশলী হতে হবে বলে মনে করছেন কোচ লি মিন কুয়ান । তাদের প্রধান প্রতিযোগী দেশ জাপান আর তিয়াপেই চিন । খেলোয়াড়রা যদি সর্বশক্তি নিয়োগ করে খেলেন, তা হলে এশিয়াডের মহিলা সফ্টবলের মুকুট জিতে নেওয়া খুব কঠিন হবে না ।

বিগত সোল এশিয়াডে সোনার পদক বেশি পাওয়ায় চিনকেই বিজয়ী বলে গণ্য করা হয়েছিল । যে বিপুল শক্তি নিয়ে চিন এবার প্রতিযোগিতায় নামছে, তাতে মনে হয় সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ মিলে মোট পদক-তালিকার শীর্ষস্থানটিও তারা দখল করে নেবে ।

জিমন্যাসটিকস থেকে চিনের মেয়েরা কয়েকটি সোনা পাবেনই

বিশ্বক্রীড়ায় দক্ষিণ কোরিয়া এখন পুরোভাগে

শুধু এশিয়াডেই নয়, ওলিম্পিকেও অভাবনীয় সব কান্ড ঘটিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া । লিখেছেন **সব্যসাচী সরকার**

সোল ওলিম্পিক শেষ হওয়ার পরে ইংল্যাণ্ডের এক সাংবাদিক লিখেছিলেন, "দেখাল বটে দক্ষিণ কোরীয়রা । এই নিয়ে পর পর তিনটি ওলিম্পিক 'কভার' করলাম । একেবারে ত্রুটি ছিল না বলব না । তবে কোরীয়দের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার তুলনা হয় না ।" খুঁতখুঁতে ইংরেজদের কাছ থেকে কিন্তু এ ধরনের প্রশংসা সহজে পাওয়া যায় না । আশির দশকে দক্ষিণ কোরিয়া যে খেলাধুলোর জগতে এক লাফে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছে, এটা ঘটনা । এই ক'দিন আগেও ওলিম্পিকের পদক-তালিকায় দক্ষিণ কোরিয়ার নাম দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হত । এটা এখন অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি যে, '৮৮-র সোল ওলিম্পিকে পদক-তালিকায় দক্ষিণ কোরিয়ার স্থান চতুর্থ । অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা আর পূর্ব জার্মানির পরে দক্ষিণ কোরিয়াই বিশ্বের চতুর্থ সেরা ক্রীড়াশক্তি । দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র এশিয়াডেই নয়, ওলিম্পিকেও অভাবনীয় সব কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা । বস্তুত দক্ষিণ কোরিয়া যেখানে শেষ ওলিম্পিকে ৩৩টি পদক পেয়েছে (১২টি সোনা, ১০টি রুপো, ১১টি ব্রোঞ্জ), সেখানে এশিয়ার সেরা ক্রীড়াশক্তি বলে পরিচিত চিন পেয়েছে ২৮টি পদক (৫টি সোনা, ১১টি রুপো, ১২টি ব্রোঞ্জ) এবং রয়েছে একাদশ স্থানে । '৮৬-র সোল এশিয়াডে চিন আর কোরিয়ার মধ্যে লড়াই হয়েছিল সমানে-সমানে । মোট পদকপ্রাপ্তিতে দক্ষিণ কোরিয়া দুটি পদক বেশি পেলেও মাত্র একটি স্বর্ণপদক বেশি পেয়ে চিনই ছিল প্রথম স্থানে । এশীয় ও বিশ্বক্রীড়ায় কোরীয়দের উত্থান আশির দশকের একটি অন্যতম চমকপদ ঘটনা । এবারের বেজিং এশিয়াডে নাকি আরও চমক দেখাবে কোরীয়রা । হকির কথাই ধরা যাক । ১৯৮২ অবধি এশীয় হকি বলতে ছিল ভারত আর পাকিস্তান । প্রতিবারই এশিয়াডে ফাইনাল খেলা হত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে । '৮৬-তে সোলে ভারতকে লড়াই করতে হল ব্রোঞ্জের জন্য, আর বিশ্বের অন্যতম সেরা দল পাকিস্তানকে হারিয়ে হকির সোনা জিতে নিল দক্ষিণ কোরিয়া । এর পর টেবল টেনিস । ১৯৬১-তে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ২৫ বছর বিশ্বে এমন কোনও প্রতিযোগিতা হয়নি যেখানে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই পরাজিত হয়েছে চিন । কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, এশীয় টেবল টেনিসে দক্ষিণ কোরিয়া কোনওদিন হারিয়ে দিতে পারে চিনকে ।

দক্ষিণ কোরিয়ার মেয়ে কিম জিম হো তীরন্দাজিতে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন । এবারও দক্ষিণ কোরিয়ার তীরন্দাজরা বেজিং এশিয়াডে ভাল ফল করবেন । অন্যান্য বিভাগেও অংশ নিচ্ছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সেরা খেলোয়াড়রা ।

কিন্তু তাই ঘটেছিল সোলে । ১৮ বছর বয়সী স্কুলের ছাত্র য়ু নাম কু হারিয়ে দিলেন তৎকালীন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান চিনের জিয়াং জিয়া লিং-কে । বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান চিনের পুরুষ দলকে হারতে হল দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে । একই ঘটনা ঘটল মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপেও । ব্যাডমিন্টনে মাত্র কয়েক মাস আগে টমাস কাপ (বিশ্ব-চ্যামপিয়ানশিপ) জয়ী চিনের পুরুষ দল পরাজিত হল দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে । মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতাতেও ছিল কোরীয়দেরই জয়জয়কার । জুডো, জিমন্যাসটিকস, অ্যাথলেটিকসেও দক্ষিণ কোরিয়া ঘটাল একের পর এক অঘটন । বক্সিংয়ে তো দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীই কেউ নেই এশিয়ায় । সোল এশিয়াডে একদিনে বক্সিং-এর ১২টি সোনা জিতেছিল দক্ষিণ কোরিয়া । আর্চারিতে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেমে ১৬ বছরের ছেলে ইয়াং চ্যাং হুন জিতে নিয়েছিল চারটি সোনার পদক । টেনিসেও কোরীয়রাই ছিল সেরা । ডেভিস কাপার য়ু জিন সুন জিতেছিলেন সিঙ্গলস, ডাবলস, মিক্সড ডাবলস এবং পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতা । অ্যাথলেটিকসে ১৭ বছরের মেয়ে লিম চুন যে সোনা পেয়েছিলেন ৮০০ মিঃ, ১৫০০ মিঃ এবং ৩০০০ মিঃ দৌড়ে । তাঁকে বলা হয় এশিয়ার জোলা বাড । ফুটবলে যে দক্ষিণ কোরিয়া পর পর দুটি বিশ্বকাপে ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই । তবু উল্লেখযোগ্য যে, গত এশিয়াডে ফুটবলের সোনা ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার দখলেই । সহজেই সৌদি আরবকে ফাইনালে ২-০ গোলে হারিয়েছিল তারা । এবারের ইতালি বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়া আশানুরূপ খেলতে না পারলেও তার কাছ থেকে ফুটবলের শিরোপা কেড়ে নিতে গেলে অন্য দেশগুলোকে নিজেদের ছাপিয়ে যেতে হবে ।

বেজিং এশিয়াডের প্রাক্কালে সবদিক বিচার করলে পদক-তালিকায় কে প্রথম স্থানে থাকবে, তার সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না । যেহেতু বেজিংয়ে হচ্ছে এশিয়াড, তাই চিনকে কিছুতেই দক্ষিণ কোরিয়ার পেছনে রাখা যাচ্ছে না । চিরকালই আয়োজনকারী দেশ অনেক বাড়তি সুযোগ-সুবিধে পায় । কিন্তু এশিয়াড যদি চিনে না হয়ে অন্য কোথাও হত ? নিঃসন্দেহে পদক-তালিকার শীর্ষে থাকার জন্য ফেভারিট হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়াকেই রাখতে হত ।

জাপানের পদক-সংখ্যা কমেই যাচ্ছে

খেলাধুলোয় এক সময় জাপান ছিল এশিয়ার সেরা শক্তি । এখন তারা পিছু হটছে । লিখেছেন **সমীরণ ঘোষ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে দুটো বোমা পড়েছিল, তখন বিশ্বের বড়-বড় দেশগুলো ভেবেছিল, জাপান দেশটার মেরুদণ্ডই বোধ হয় ভেঙে দেওয়া গেছে । আর কখনও ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না । কিন্তু বেঁটেখাটো জাপানিরা ভেবেছিল অন্যরকম । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তরতর করে উন্নতির শিখরে উঠেছে জাপান । কি প্রযুক্তি কি বাণিজ্য, কি খেলাধুলো—সবকিছুতেই জাপানিরা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে । '৮৮-তে সোলে ওলিম্পিক হওয়ার আগে জাপানই ছিল এশিয়ার একমাত্র দেশ, যাঁরা ওলিম্পিক আয়োজন করার সাহস দেখিয়েছে । সেই ১৯৫১ সালে দিল্লির প্রথম এশিয়াড থেকে শুরু করে ১৯৭৮-এ ব্যাঙ্ককের অষ্টম এশিয়াড পর্যন্ত পর পর আটটি এশিয়াডে পদক-তালিকায় শীর্ষে থেকেছে জাপানিরা । '৮২ সালে এশিয়াডে সামান্য ব্যবধানে চিন পদক-তালিকায় প্রথম স্থানে উঠে আসে । '৮৬তে সোলে চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরে পদক-তালিকায় তৃতীয় স্থানে নেমে আসে জাপান ।

খেলাধুলোয় তা হলে কি পিছিয়ে পড়ল জাপানিরা ? জাপানের পত্রপত্রিকাগুলো কিন্তু তা মানতে রাজি নয় । জাপানের সাংবাদিকরা মনে করেন, এখন জাপানে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে খারাপ সময় চলছে । বেজিং এশিয়াডেই আবার জাপান দেখিয়ে দেবে যে, তারা চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না । কিন্তু তাঁরা যাই বলুন, জাপান যে চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে হঠাৎই বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই । এখন প্রশ্ন, জাপান বেজিং এশিয়াডে কেমন ফল করবে ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের একাদশ এশিয়াডের শেষ দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । তবে জাপানের সম্ভাবনা নিয়ে এখন আলোচনা করা যেতে পারে ।

জাপানি সাঁতারুদের খ্যাতি বিশ্বজোড়া । দিল্লির প্রথম এশিয়াডে একজনও জাপানি সাঁতারু অংশগ্রহণ করেননি । সিঙ্গাপুরের সাঁতারুরা পদক কুড়িয়েছেন । তবু জাপান মোট ৬০টি পদক পেয়ে পদক-তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে । অবশ্য ম্যানিলার দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস থেকে সুইমিং পুলে জাপানিদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কাউকে দেখা যায়নি । টোকিওর তৃতীয় এশিয়ান গেমসের আসরে একটি বাদে সাঁতারের সবক'টি সোনা জাপানিরা দখল করেছিল । টি· ইয়ামানাকা তো ৪০০ মিঃ ফ্রিস্টাইলে বিশ্বরেকর্ড করে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছিলেন । '৬২-তে জাকর্তা এবং '৬৬-তে ব্যাঙ্ককেও জাপানের সুনাম অক্ষুণ্ণ থেকেছে । '৬৬-তে ব্যাঙ্ককে একদিনে ১৩টি সোনা জিতেছিল তারা । সাঁতারের ২৬টি সোনার মধ্যে ১০টিতে ছিল রেকর্ড টাইমিং । অ্যাথলেটিকস, টেবল টেনিস, কুস্তিতেও সেবার জাপানই ছিল সেরা । '৭০-এ ব্যাঙ্ককে যেখানে জাপান জিতেছিল ৭৪টি সোনা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দঃ কোরিয়া সেখানে পেয়েছিল মাত্র ১৮টি সোনা । সেখানে এই গেমসে সবাইকে অবাক করে জাপানের স্কুলছাত্রী জোসিমি সিগওয়া সাঁতারে পাঁচটি সোনা পায় । '৭৪-এ তেহেরানে প্রথমবার অংশগ্রহণ করে চিন চ্যালেঞ্জ করে জাপানকে । অ্যাথলেটিকসের শিরোপাগুলি জাপান চিন ও ভারত ভাগাভাগি করে নেয় কিন্তু জিমন্যাসটিকসে ঘটে যায় বড়রকমের পট পরিবর্তন । জাপানের এতদিনকার আধিপত্য খর্ব করে বেশিরভাগ সোনা জিতে নেয় চিন । দঃ কোরিয়া আর উঃ কোরিয়াও প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতে তাদেরও দমিয়ে রাখা যাবে না । '৭৮-এ ব্যাঙ্ককে সাঁতারে বেশি সোনা জাপানিরা পেলেও, ডাইভিং-এ পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চিন প্রায় সবক্ষেত্রেই সোনা জিতে নেয় । এই গেমসেই চিনের ১৬ বছরের মেয়ে চেন সিয়া সিয়া বিশ্ব প্ল্যাটফর্ম ডাইভিং-এর রেকর্ড ভেঙে দেয় । চিন তখনও আন্তর্জাতিক ডাইভিং সংস্থার সদস্য না হওয়ায় সেই রেকর্ড গ্রাহ্য হয়নি । এই

পাঁচটি এশিয়াডে হ্যামার থ্রোতে সোনা জিতে অনন্য নজির গড়েছেন জাপানের শিগেনোবু মুরোফুসি (মাঝখানে)

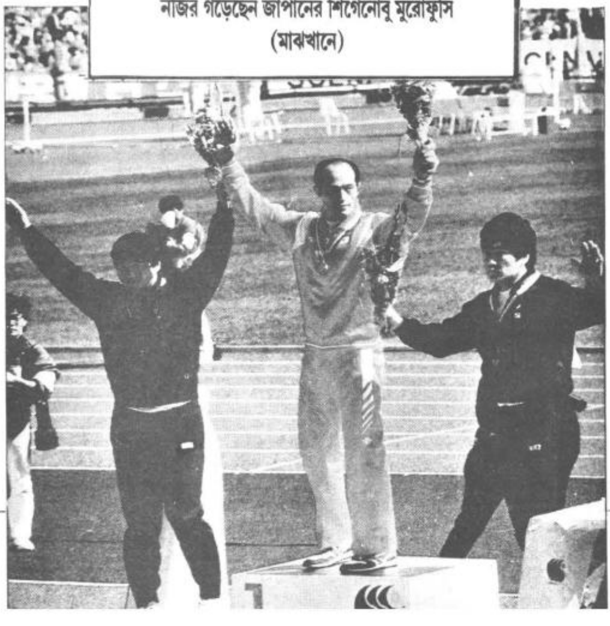

গেমসেই জাপানিরা বুঝতে পারে চিনকে আর দ্বিতীয় স্থানে রাখা যাবে না। টেবল টেনিস এবং জিমন্যাসটিকস-এ তো বটেই, অন্যান্য ইভেন্টেও চিন বারবার হারিয়ে দিতে থাকে জাপানকে। শেষ পর্যন্ত দিল্লির নবম এশিয়াডে চিন টপকে যায় জাপানকে। প্রথম দিন থেকেই চিন আর জাপানের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কে থাকবে পদক-তালিকায় প্রথম স্থানে ও শেষদিন পর্যন্ত সমানে-সমানে চলেছে লড়াই। দেখা গেল যে, চিন আর জাপান দুটি দেশই মোট ১৫৩টি পদক পেয়েছে, কিন্তু চারটি স্বর্ণপদক বেশি পাওয়ার জন্য চিনই প্রথম হয়।

সোলে ২৫টি ইভেন্টে মোট ২৬৯টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ২৪৫টি স্বর্ণপদকই ভাগাভাগি করে নিয়েছে চিন, দঃ কোরিয়া এবং জাপান। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় এই তিনটি দেশের তুলনায় এশিয়ার অন্যান্য দেশ কত পিছিয়ে। কিন্তু জাপান কেন পিছিয়ে পড়ছে চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায়? সোল এশিয়াডের সময় জাপানি এক সাংবাদিক দুঃখ করে বলেছিলেন, "আসলে আমরা টেকনোলজি-টেকনোলজি করে এত লাফাই যে, খেলাধুলোয় আর আগের মতো গুরুত্ব দিই না। কাজেই আমাদের দেশে একজন পদকজয়ীর চেয়ে একজন বিজ্ঞানীর দাম বেশি। আমরা ভুলে গেছি যে, একটা দেশের উন্নতির পেছনে খেলাধুলোর অবদানও বড় কম নয়।" সোলে জাপানিরা পেয়েছে মাত্র ৫৮টি সোনা। জাপানের এই অবনতি সত্ত্বেও কয়েকজন জাপানি ক্রীড়াবিদের নাম না করে থাকা যায় না। যেমন, হ্যামার থ্রোয়ার শিগেনোবু মুরোফুসি। ভদ্রলোক চিনে জন্মেছিলেন, কিন্তু জাপানের হয়ে পর পর পাঁচটি এশিয়াডে হ্যামার থ্রোতে সোনা জিতে তিনি অনন্য নজির গড়েছেন। বেজিং এশিয়াডে যদি ইনি দলে থাকেন ও আর একটি সোনা জেতেন, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কম যান না সাঁতারু কাৎসুনোরি ফুজিয়ারা-ও। সোলে সুইমিং পুল তোলপাড় করে পরপর চারটি সোনা (১০০ মিঃ ফ্রিস্টাইল, ২০০ মিঃ ফ্রিস্টাইল, ৪ × ১০০ মিঃ মেডলি রিলে ও ৪ × ২০০ মিঃ ফ্রিস্টাইল রিলে) জিতেছিলেন তিনি।

অ্যাথলেটিকসে ট্র্যাক ইভেন্টগুলিতে গত এশিয়াডে যেখানে চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে তিনটি করে সোনা, সেখানে জাপানিরা পেয়েছে ছ'টি সোনা। পুরুষদের ম্যারাথনে আর-একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেলে বিশ্বরেকর্ড করে ফেলতেন তাকেয়উকি নাকায়ামা। ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট ২১ সেকেন্ডে সোনা জেতেন তিনি, যা ছিল বিশ্বের দ্বাদশ দ্রুততম সময়। মেয়েদের ম্যারাথনে সোনা জিতে এরিকো আসাই জাপানকে ম্যারাথনে 'ডাবল গোল্ড' পেতে সাহায্য করেন। ৪০০ মিঃ দৌড়ে এশীয় রেকর্ড করে সোনা জেতেন সুসুমোতাকানো। এ ছাড়া সাঁতার, বোলিং, সাইক্লিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, তীরন্দাজি, শুটিং প্রভৃতি খেলাতেও জাপান বেশ কিছু সোনা তুলে নেয়।
চিনারা মনে করেন, খেলাধুলোয় তাঁরাই এশিয়ার সেরা শক্তি। কোরীয়রা বলেন, বেজিং-এ প্রথম দুটি স্থানে চিন এবং দঃ কোরিয়াই থাকবে। তা হলে কি জাপান আর কখনও প্রথম স্থানে উঠে আসতে পারবে না? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আগামী ৬ অক্টোবর বেজিং এশিয়াড শেষ হওয়ার দিন।

বিনামূল্যে ফেম থেকে

প্রতি ৯০ গ্রা. প্যাক-এর সঙ্গে
২টি অপূর্ব ব্যাগ ক্লিপ বিনামূল্যে

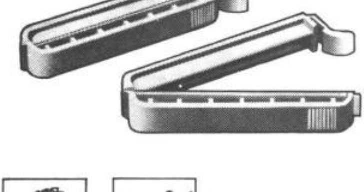

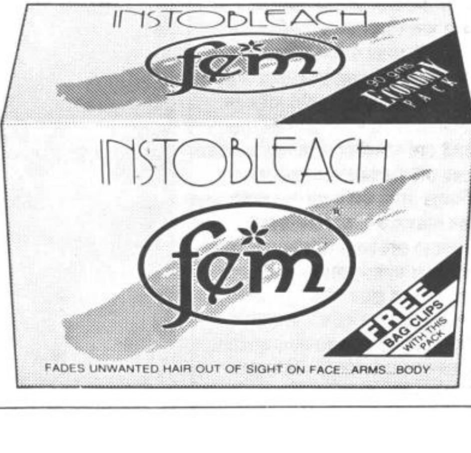

তাড়াতাড়ি! *স্টক থাকা পর্যন্তই এই সুযোগ পাবেন।*

Dazzal-Ben

ভারত কেমন করবে

ভারতের বেশ বড় দলই যাচ্ছে বেজিংয়ে । ক'টি পদক পেতে পারেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা ? আলোচনা করেছেন **সুজিত দাশগুপ্ত**

নয় নয় করেও দুশোর ওপর ভারতীয় প্রতিযোগী এবারের এশিয়ান গেমসে যোগ দিচ্ছেন । সরকার কঠোর মনোভাব নেওয়ায় সদস্যসংখ্যা বাড়তে পারেনি । যোগদানের অনুমতি পায়নি ফুটবল দল । যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা সবাই যে যোগ্যতামান অতিক্রম করেছেন তাও নয় । আর যোগ্যতামান পেরোলেও, তাতে পদক পাওয়ার সম্ভাবনা এতটুকু উজ্জ্বল হয় না । যে গতিতে এগিয়েছেন চিন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিযোগীরা, সেই তুলনায় ভারত এখনও অনেক পেছনে । তার ফলে ভারতের পদক-সম্ভাবনা যে খুবই কম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

গত সোল এশিয়ান গেমসে ভারতকে চারটি সোনা এনে দিয়েছিলেন পি·টি·উষা । এবারেও প্রধান ভরসা সেই উষাই । তাঁকে এবারেও বেজিং-এ যেতে হচ্ছে এবং অন্তত চারটি ইভেন্টে তিনি নামবেনই—২০০, ৪০০, ৪০০×৪ মিটার দৌড় এবং ৪০০ মিটার হার্ডলস রেস । ২০০, ৪০০ মিটার দৌড় ও হার্ডলসে তিনি অবশ্য যোগ্যতামান অতিক্রম করতে পারেননি । তবে উষা এবং তাঁর কোচ নাম্বিয়ারের মতে, বেজিংয়ে তিনি ভাল ফল করবেনই । সাময়িক আঘাত এবং অসুস্থতার জন্য তিনি ট্রায়াল-এ সেরা সময় করতে পারেননি । উষার ওপর আশা রেখেও বলা যায়, ৪০০ মিটার হার্ডলসে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়বেন তিনি । ১৯৮২তে লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকের সময় উষার ফর্ম ছিল তুঙ্গে, তাঁর বয়সও তখন ছিল কম, মাত্র বাইশ বছর । অল্পের জন্য উষা পদক পাননি, সময় করেছিলেন ৫৫·৪২ সেকেন্ড । এই সময় আর তিনি জীবনে করতে পারেননি, সোল এশিয়াডে সোনা পেলেও সময় ছিল বেশি—৫৬·০৮ সেকেন্ড । সম্প্রতি চিনের কুড়ি বছরের তরুণী চেন সুইং ৫৫·১২ সেকেন্ডে চারশো মিটার হার্ডলস টপকে উষার এশিয়ান রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন । বেজিংয়েও যদি এই সময় তিনি করতে পারেন, তা হলে উষাকে সোনা পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে । কারণ এই সময়ের ধারেকাছে যাওয়ার ক্ষমতা এখন আর তিরিশ বছরের পি·টি·উষার নেই ।

তুলনামূলকভাবে ২০০ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে উষার সোনার সম্ভাবনা অনেক বেশি । ৪×৪০০ মিটার রিলে দলে উষা ছাড়াও আছেন কে সরমা, প্রণতি মিশ্র, শান্তিমল ফিলিপস ও আলফানসো রেয়ন । গত এশিয়ান গেমসে এই ইভেন্টে ভারত রেকর্ড করেছিল ৩ মিনিট ৩৪·৫৮ সেকেন্ডে দৌড়ে । সেই দলের একমাত্র উষাই অবশ্য এই দলে আছেন । বাকি চারজনই নতুন । এই ইভেন্টে উষার দল যোগ্যতামান অতিক্রম করেছে এবং আশা করা যায়, ভারত একটি পদক পেতেও পারে । ১০০ মিটার দৌড়ে উষা নামলে পদক-সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, অশ্বিনী নাচাপ্পা উষাকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করার পর আসল আসরে কিছু করতে পারেন কি না সেটাও দেখার ।

পুরুষ অ্যাথলেটদের মধ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা, ১৫০০ মিটার দৌড়ে ২৫ বছর বয়স্ক বাহাদুর প্রসাদের । যোগ্যতামান তো অতিক্রম করেছেনই বাহাদুর, গত বছর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে যে সময় করেন (৩ মিনিট ৪১·৯৮ সেকেন্ড) তা বেজিংয়ে সোনা জয়ের পক্ষে যথেষ্ট । এই সময়ের কাছাকাছি এখন এশিয়াতে আর কেউ দৌড়চ্ছেন না ।

৮০০ মিটার দৌড়ে সার্ভিসেসের বিজয়কুমারন ও অবতার সিং যে সম্ভাবনা দেখিয়েছেন, তা চার্লস বোরেমিও এবং শ্রীরাম সিং-এর পর আর দেখা যায়নি । আশা করা যায়, এঁরা একটি পদক আনতে পারেন । শটপাটে ভারতের এস ডি এশান বা বাহাদুর সিং-এর মধ্যে যে কেউ পদক পেতে পারেন । বাহাদুরের এটি পঞ্চম এশিয়াড অভিযান । গতবার কোনও পদক পাননি বাহাদুর । এবার এশান এবং বাহাদুর, সোনা না হলেও ব্রোঞ্জ পদক পেতেও পারেন । লংজাম্পে শ্যামকুমারের পদক পাওয়ার সম্ভাবনা কম, স্টিপেলচেসে দিনা রামও পদক পাবেন বলে মনে হয় না । ৪×৪০০ মিটার রিলেতে পি বাইজু, পি ভি রাজু, অর্জুন দেবাইয়া এবং মুরলীধরনের পুরুষ দল ভাল ফল করতে পারেন ।

অ্যাথলেটিকস ছাড়া ভারত হকি, শুটিং, কুস্তি, তীরন্দাজি, ভারোত্তোলন ইত্যাদিতেও দু-একটি পদক পেতে পারে । শেষ পর্যন্ত ক'টি পাবে তা একেবারে অনিশ্চিত । ভারতীয় প্রতিযোগীদের ওপর ভরসা রাখা যায় না, এটাই দুঃখের ।

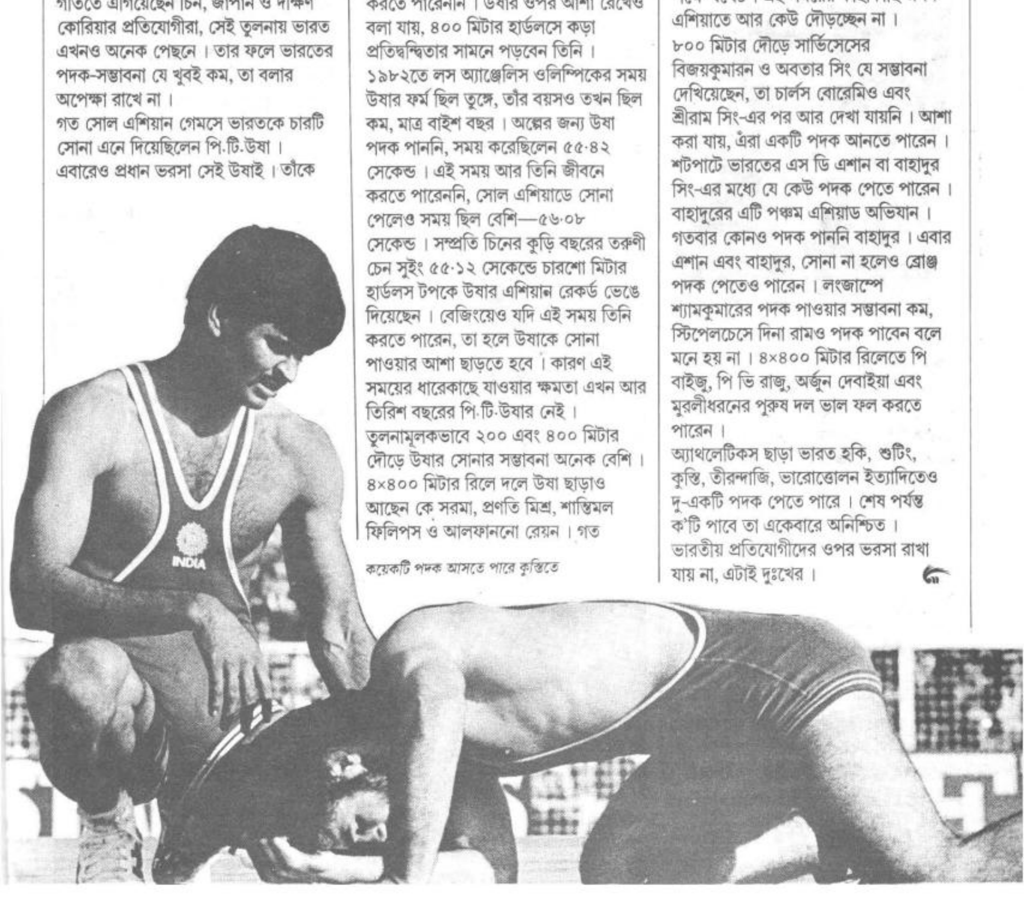

কয়েকটি পদক আসতে পারে কুস্তিতে

এশিয়াডে বাংলার মেয়েরা

বাংলার বেশ কয়েকজন মেয়ে এবারের এশিয়াডে ভারতীয় দলে আছেন । তাঁদের নিয়ে লিখেছেন **সমীরণ সেন**

বাংলার মেয়েরা এবারের এশিয়ান গেমসে যোগ দিতে চিনে যাচ্ছেন । এঁদের মধ্যে আছেন তিন অ্যাথলিট—কবিতা গারারি, চিত্রা চৌধুরী ও প্রণতি মিশ্র, শুটিং-এ সোমা দত্ত, কুহেলি গাঙ্গুলি ও মৌসুমী দাস, ভারোত্তোলনে জ্যোৎস্না দত্ত এবং ছায়া আদক । এশিয়াডে এঁদের সম্ভাবনা কতটুকু ? কবিতা, চিত্রা, প্রণতিরা পদক পেলেও পেতে পারেন, অন্যদের সম্ভাবনা কম । দক্ষতার শীর্ষে উঠতে পারলে অবশ্য অন্য কথা । নিজের জাতীয় রেকর্ড ভাঙলেও কবিতা কিন্তু প্রথমে এশিয়াডের যোগ্যতামানই পেরোতে পারেননি । কয়েক মাস আগে গুয়াহাটিতে দশ কিলোমিটার হাঁটার জাতীয় প্রতিযোগিতায় সোনা এবং রুপো জেতেন কবিতা ও চিত্রা । তারপর এবারের

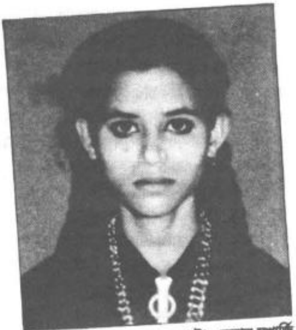

চিত্রা চৌধুরী ফোটো : তমাল মুখার্জি

আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় সোনা ও রুপো পান তাঁরা । কবিতা দু' বছর আগে জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন ৫৪ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে । পরে কবিতা আবার তা ভেঙে দিয়ে নতুন সময় করেন ৫৩ মিনিট ০·৩ সেকেন্ড । কিন্তু বেজিং এশিয়াডের জন্য যোগ্যতামান ধরা হয়েছিল ৫২ মিনিট । অবশেষে কবিতা ও চিত্রা মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার সময় আরও ভাল করে বেজিং যাওয়ার ছাড়পত্র পান । কবিতা হাঁটলেন ৫১ মিনিট ৩৬·০ সেকেন্ডে, চিত্রার সময় ৫১ মিনিট ৩৭·০ সেকেন্ড । কবিতা গারারি ও চিত্রা চৌধুরী দু'জনেই কাঁচরাপাড়ার মেয়ে । কবিতার আবার প্রিয় বান্ধবীও চিত্রা । চিত্রা থাকেন কবিতার বাড়ির কিছুটা দূরে । দশ কিলোমিটার হাঁটায় দু'জনের সময়ের দূরত্ব কিন্তু এত নয়, ব্যবধান মাত্র এক সেকেন্ডের । সুতরাং এঁদের নিজেদের লড়াইটাও বেশ তীব্র । এই লড়াই করেই বেজিং এশিয়াডে সময় কমাতে চান দু'জনে । গত বছর এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছিলেন তরুণী কবিতা । সময়ও প্রায় ছ' সেকেন্ড কমিয়েছিলেন । কবিতার আশা, পাতিয়ালায় কোচ আর· কে· মেহতার সহায়তায় তিনি নিজের ফর্মের তুঙ্গে উঠবেন প্রতিযোগিতার সময় । কবিতার আশা, ভাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেলে তাঁদের দু'জনেরই সময় আরও কমবে । কবিতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন, "প্রাণপণ লড়াই করলে এশিয়ান গেমসে সোনা না পাওয়ার কারণ নেই ।" চিত্রা অবশ্য সোনার ব্যাপারে এতটা আশাবাদী নন । তাঁর কথায়, "৪৮ মিনিটের কাছাকাছি সময় করতে পারলে ব্রোঞ্জ জেতার আশা আছে । সেটা পারাই এখন আমার লক্ষ্য ।" অর্থাৎ, দুই তরুণীরই লক্ষ্য এখন পদক । সেই লক্ষ্যেই ওঁরা দু'জন এখন তাকিয়ে আছেন ২৭ সেপ্টেম্বরের সকাল আটটার দিকে । ওই সময়ই দশ কিলোমিটার হাঁটায় তাঁদের দু'জনেরই অগ্নিপরীক্ষা ।

বাংলার আর এক-মেয়ে প্রণতি মিশ্রও পদক পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী । কারণ, তাঁর দলে আছেন পি· টি· উষা । প্রণতি এশিয়াডে যাওয়ার যোগ্যতা পেয়েছেন ১৬০০ মিটার রিলে দলের হয়ে । ৪×৪০০ মিটার রিলে দলে প্রণতির সঙ্গে থাকছেন উষা ছাড়া শান্তিমল ফিলিপস ও আলফানসো রায়ান । প্রণতির মতে, "আমরা চারজনে যদি ঠিকঠাক দৌড়তে পারি, তা হলে একটা পদক ভারতে

সোল এশিয়াডে রাইফেল শুটিংয়ে রুপো ও ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন সোমা দত্ত ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ভারোত্তোলনে অংশ নিচ্ছেন ছায়া আদক এবং জ্যোৎস্না দত্ত। ছায়া ৫৬ কেজি বিভাগে এবং জ্যোৎস্না ৮২·৫ কেজি বিভাগে অংশ নেবেন। এঁদের লড়াই করেই পদক জিততে হবে। অঘটন ঘটলে অবশ্য আলাদা কথা। দক্ষতার বিচারে কবিতারই এশিয়াডে পদক পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে চিত্রা, প্রণতিরাও আছেন। দেখা যাক, বাংলার কোন মেয়ে আমাদের গর্বিত করেন।

জ্যোৎস্না দত্ত

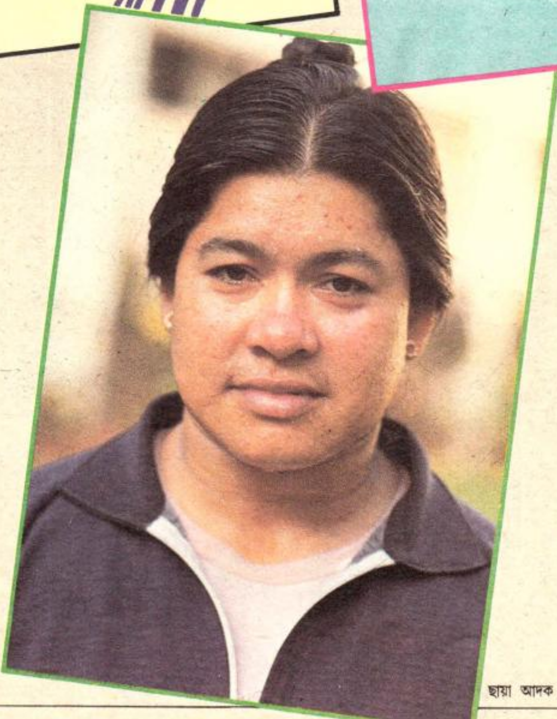

ছায়া আদক

আসবেই।" আশাবাদী প্রণতির কথা কতটা মেলে সেটাই দেখার।

বাংলার সোমা দত্ত রাইফেল শুটিং-এ এর আগেও নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন। সোমা এবারে স্ট্যান্ডার্ড রাইফেল থ্রি পজিশন, স্ট্যান্ডার্ড রাইফেল প্রন এবং এয়ার রাইফেল—এই তিন বিভাগে এশিয়াডে লড়াই করবেন। কুহেলি গাঙ্গুলি এবং মৌসুমী দাস আছেন স্ট্যান্ডার্ড রাইফেল প্রন বিভাগে। বর্তমানে চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মহিলা শুটারদের পারদর্শিতা এত বেশি যে, এঁরা কতটা সফল হবেন বলা মুশকিল। প্রতিযোগিতার দিন কে কেমন ফর্মে থাকেন তার ওপরেই অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে।

ভারোত্তোলনে অংশ নিচ্ছেন ছায়া আদক এবং জ্যোৎস্না দত্ত। ছায়া ৫৬ কেজি বিভাগে এবং জ্যোৎস্না ৮২·৫ কেজি বিভাগে অংশ নেবেন। এঁদের লড়াই করেই পদক জিততে হবে। অঘটন ঘটলে অবশ্য আলাদা কথা। দক্ষতার বিচারে কবিতারই এশিয়াডে পদক পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে চিত্রা, প্রণতিরাও আছেন। দেখা যাক, বাংলার কোন মেয়ে আমাদের গর্বিত করেন।

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

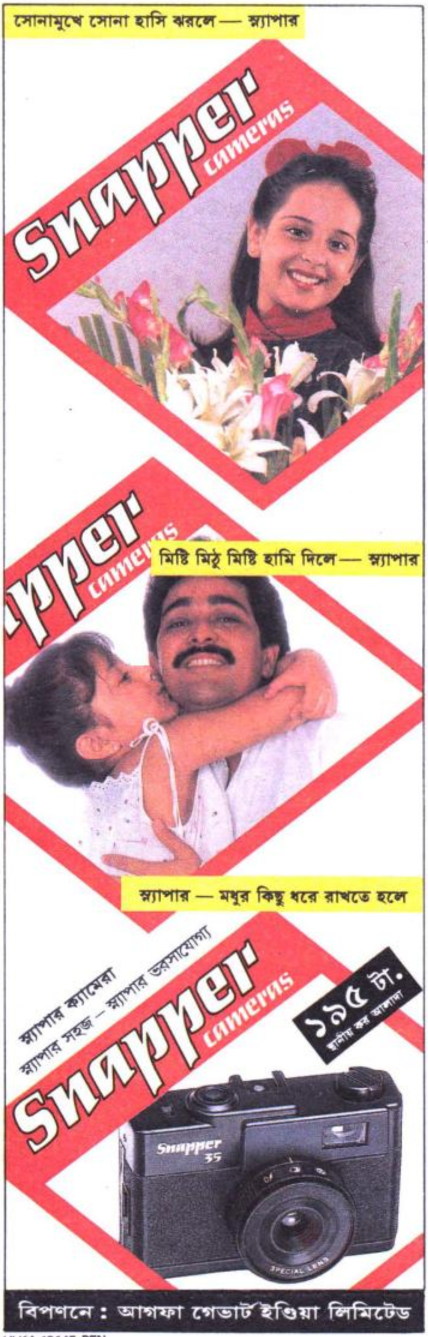

ULKA 13145-BEN

ভারতের সোনাজয়ী

প্রথম এশিয়াড : ১৯৫১

১। লেভি পিন্টো (১০০ মিটার দৌড়)
২। লেভি পিন্টো (২০০ মিটার দৌড়)
৩। রঞ্জিত সিং (৪০০ মিটার দৌড়)
৪। নিক্কা সিং (১,৫০০ মিটার দৌড়)
৫। ছোটা সিং (ম্যারাথন দৌড়)
৬। ৪×৪০০ মিটার রিলে দল
৭। মদনলাল (লোহার বল ছোঁড়া)
৮। মাখন সিং (ডিসকাস থ্রো)
৯। মহাবীর প্রসাদ (১০,০০০ মিটার দৌড়)
১০। বক্তোয়ার সিং (৫০ কি· মি· হাঁটা)
১১। শচীন নাগ (১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতার)
১২। কে· পি· ঠক্কর (প্ল্যাটফর্ম ডাইভিং)
১৩। কে· পি· ঠক্কর (স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং)
১৪। ফুটবল দল (অধিনায়ক : শৈলেন মান্না)
১৫। ওয়াটারপোলো দল

দ্বিতীয় এশিয়াড : ১৯৫৪

১। সারোয়ান সিং (১১০ মিটার হার্ডলস)
২। অজিত সিং (হাই জাম্প)
৩। পারদুমন সিং (ডিসকাস থ্রো)
৪। পারদুমন সিং (লোহার বল ছোঁড়া)
৫। ৪ × ১০০ মিটার রিলে দল (মেয়েদের)

তৃতীয় এশিয়াড : ১৯৫৮

১। মিলখা সিং (২০০ মিটার দৌড়)
২। মিলখা সিং (৪০০ মিটার দৌড়)
৩। মহিন্দর সিং (ট্রিপল জাম্প)
৪। পারদুমন সিং (লোহার বল ছোঁড়া)
৫। বলাকার সিং (ডিসকাস থ্রো)

চতুর্থ এশিয়াড : ১৯৬২

১। ফুটবল দল (অধিনায়ক : চুনী গোস্বামী)
২। মিলখা সিং (৪০০ মিটার দৌড়)
৩। মহিন্দর সিং (১,৫০০ মিটার দৌড়)
৪। তারলোক সিং (১০,০০০ মিটার দৌড়)
৫। গুরবচন সিং (ডেকাথলন)
৬। ৪ × ৪০০ মিটার রিলে দল (পুরুষ)
৭। মারুতি মানে (কুস্তি : লাইট হেভিওয়েট)
৮। মালোয়া (কুস্তি : ফ্লাই, গ্রেকো : রোম্যান)

মিলখা সিং

৯। জি· আঁদেলকর (কুস্তি : হেভি, গ্রেকো : রোম্যান)
১০। পদম বাহাদুর মল (বক্সিং : লাইটওয়েট)

ফোটো : উৎপল স

পঞ্চম এশিয়াড : ১৯৬৬

১। হকি দল
২। আজমির সিং (৪০০ মিটার দৌড়)
৩। বি· এম· বড়ুয়া (৮০০ মিটার দৌড়)
৪। ভীম সিং (হাই জাম্প)
৫। যোগিন্দর সিং (লোহার বল ছোঁড়া)
৬। পরভিন কুমার (ডিসকাস থ্রো)
৭। হাওয়া সিং (বক্সিং : হেভিওয়েট)

কর্তার সিং

ষষ্ঠ এশিয়াড : ১৯৭০

১। মহিন্দর সিং গিল (ট্রিপল জাম্প)
২। যোগিন্দর সিং (লোহার বল ছোঁড়া)
৩। পরভিন কুমার (ডিসকাস থ্রো)
৪। কমলজিৎ সাঁধু (মেয়ে : ৪০০ মিটার দৌড়)
৫। চাঁদগি রাম (কুস্তি : হেভিওয়েট)
৬। হাওয়া সিং (বক্সিং : হেভিওয়েট)

সপ্তম এশিয়াড : ১৯৭৪

১। বিজয় সিং চৌহান (ডেকাথলন)
২। টি· যোহানন (লং জাম্প)
৩। শ্রীরাম সিং (৮০০ মিটার দৌড়)
৪। শিবনাথ সিং (৫,০০০ মিটার দৌড়)

অষ্টম এশিয়াড : ১৯৭৮

১। হরিচাঁদ (৫,০০০ মিটার দৌড়)
২। হরিচাঁদ (১০,০০০ মিটার দৌড়)
৩। শ্রীরাম সিং (৮০০ মিটার দৌড়)
৪। জ্ঞান শেখরন (২০০ মিটার দৌড়)
৫। সুরেশ বাবু (লং জাম্প)
৬। বাহাদুর সিং (লোহার বল ছোঁড়া)
৭। গীতা জুৎসি (মেয়ে : ৮০০ মিটার দৌড়)
৮। হাকাম সিং (২০ কি· মি· হাঁটা)
৯। রণধীর সিং (ট্র্যাপ শুটিং)
১০। কর্তার সিং (কুস্তি : লাইট হেভিওয়েট)
১১। রাজিন্দর সিং (কুস্তি : ওয়েল্টার)

নবম এশিয়াড : ১৯৮২

১। চাঁদরাম (২০ কি· মি· হাঁটা)
২। বাহাদুর সিং (শটপাট)
৩। চার্লস বোরেমিও (পুরুষ : ৮০০ মিটার দৌড়)
৪। এম· ডি· বালসাম্মা (মহিলা : ৪০০ মিটার দৌড়)
৫। মেয়েদের হকি
৬। সৎপাল সিং (কুস্তি : ১০০ কেজি)
৭। কৌর সিং (বক্সিং : হেভিওয়েট)
৮। ঘোড়সওয়ারি, দলগত
৯। রুপি ব্রার (ঘোড়সওয়ারি : টেন্ট পেগিং)
১০। রঘুবীর সিং (ঘোড়সওয়ারি—ব্যক্তিগত)
১১। ফারুক তারাপোরে, জরির করঞ্জিয়া (ইয়টিং : ফায়ারবল)
১২। লক্ষ্মণ সিং (গলফ : ব্যক্তিগত)
১৩। লক্ষ্মণ সিং, রাজীব মেহতা (গলফ : দলগত)

দশম এশিয়াড : ১৯৮৬

১। পি· টি· উষা (২০০ মিটার দৌড়)
২। পি· টি· উষা (৪০০ মিটার দৌড়)
৩। পি· টি· উষা (৪০০ মিটার হার্ডলস)
৪। ৪ × ৪০০ মিটার রিলে. রেস দল (মহিলা)
৫। কর্তার সিং (কুস্তি : হেভিওয়েট)

বিগত সোল এশিয়াডে ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে জয়ী ভারতের বালসাম্মা, বন্দনা রাও, সাইনি আব্রাহাম ও পি টি উষা

ফরট্রানের বাকি কথা

জনপ্রিয় ভাষা ফরট্রানে প্রোগ্রাম লেখার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কায়দাকানুন, যেগুলি ব্যবহার করে দারুণ সুন্দর প্রোগ্রাম লেখা যায় তা জানিয়েছেন **অসীমরতন ঘোষ**

ফরট্রান ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার প্রাথমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু নিয়ম ও কায়দাকানুন আগের সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে ফরট্রান ভাষার বর্ণমালা, চলরাশি, ইনপুট বিবৃতি নিয়ে বলা হয়েছে। ফরট্রান-নিয়ন্ত্রক বিবৃতিগুলির কথা বলার সময় হঠাৎ আবর্ত ও সাবপ্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা অংশটি চলে এসেছে। তাই এখন সাবপ্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা শেষ করে আমরা আবার আলোচনা করব GOTO ও IF বিবৃতি নিয়ে।

সাবপ্রোগ্রাম হল প্রায়ই প্রয়োজন পড়ে এমন ছোট ছোট প্রোগ্রাম বা তার অংশ। এদের মূল প্রোগ্রামের মধ্যে লেখার দরকার হয় না।

ফাংশন সাবপ্রোগ্রাম : ফাংশন সাবপ্রোগ্রাম অনেকটা সাবরুটিনের মতোই। তফাতটা হল এটি একটি সংখ্যা উত্তর হিসেবে মূল প্রোগ্রামকে জানায়। এতে FUNCTION শব্দটি লিখে তারপর নামটি লিখে সবশেষে বন্ধনীর মধ্যে আরগুমেন্টটি লিখতে হয়। সেটিকে ব্যবহার করে ফাংশন সাবপ্রোগ্রামটি

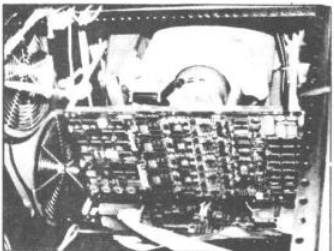

কম্পিউটারের ভেতরের ছবি

লেখা হয়। এটির শেষে RETURN এবং END শব্দ দুটি লেখা হয়। যেমন,

```
FUNCTION SQUARE (A, B)
SQUARE = (A + B) * * 2
RETURN
END
```

মূল প্রোগ্রামে 10 আর 20র যোগফলের বর্গ

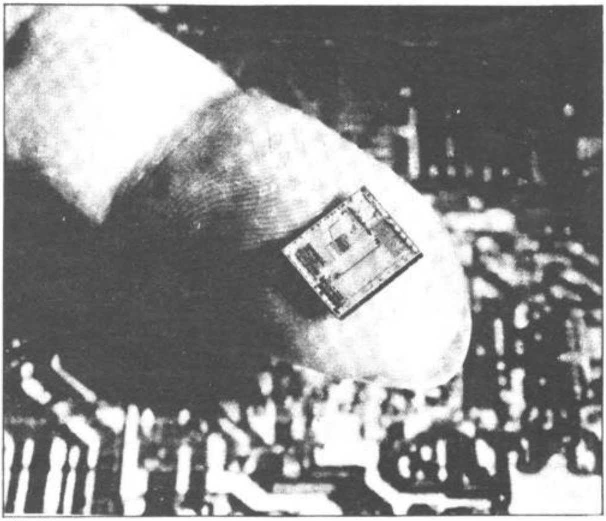

মাইক্রোপ্রসেসর

বের করতে হলে C = SQUARE (100, 20) লিখলে C-এর মান 900 হবে।

ফরট্রানে বেশ কিছু তৈরি ফাংশনও: আছে, যেমন, LOG, TAN. এদের প্রোগ্রামে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

ফরট্রানে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য ও গঠন রয়েছে। একটি ফরট্রান প্রোগ্রাম দেখানো হল :

```
C PROGRAM  PAY
   DO 50 I = 1,500
   READ (2, 10) TIME, RATE,
   RDEDUC
10 FORMAT (F 3.0, F 5.2, F 5.2)
   IF(TIME GT. 40) GO TO 20
   GROSS = TIME * RATE
   DEDUC = GROSS * REDUC
   PAY = GROSS – DEDUC
   GO TO 30
20 EXTRA = (TIME-40.0) *
   (RATE * 1.5)
   GROSS = (40.0 * RATE) +
   EXTRA
   DEDUC = GROSS * REDUC
   PAY = GROSS— DEDUC
30 WRITE (3, 1 PAY)
40 FORMAT (5 × 10 H NET
   PAY, F9.2)
50 CONTINUE
   END
```

কম্পিউটার নিয়ে অনেক আলোচনা করা হল। এর মধ্যে আমরা কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা ছাড়াও শিখে নিয়েছি কীভাবে প্রোগ্রাম লিখতে হয় লোগো, বেসিক আর ফরট্রান ভাষার মূল কথা। এই ভাষার কিছু নিয়মকানুন বলা হল না, তা

তোমরা প্রোগ্রাম লেখার সঙ্গে-সঙ্গে শিখে নেবে। ছোট-ছোট সমস্যা নিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার চেষ্টা করলে দেখবে, তা হয়ে উঠেছে এক মজার খেলা।
কম্পিউটার নিজের নিয়মে প্রোগ্রামের প্রথম লাইন থেকে কাজ করা শুরু করে শেষ পর্যন্ত পর পর করে যায়। অনেক সময় এইভাবে কাজ না করিয়ে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ বদল করা হয়। এরকমই একটি নিয়ন্ত্রক বিবৃতি হল

কম্পিউটারের ভেতরের ছবি
ফোটো : সুব্রত গুপ্ত

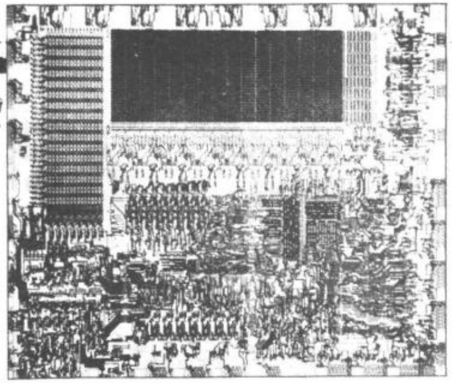

কম্পিউটার কথা শুনছে, বুঝছে, এমনকী, বলছেও

ডু-লুপ। এরকম আরও কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হল। সঙ্গে বলা হল বিন্যাস নিয়েও।

GO TO বিবৃতি : এই বিবৃতিটি ব্যবহার করে খুব সহজেই কম্পিউটারের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। GO TO র পরে লিখতে হয় যেখান থেকে আবার কাজ শুরু করতে হবে সেই বিবৃতি-ক্রমটি। যেমন :

```
... ... ...
30 GO TO 40
... ... ...
... ... ...
40 X = Y + Z
```

30 নম্বর বিবৃতিটি কম্পিউটার পড়া মাত্র পরের বিবৃতি দুটি না পড়ে সে 40 নম্বর বিবৃতিটি পড়ে সেইভাবে কাজ করে।

IF বিবৃতি : গাণিতিক ও যৌক্তিক চিহ্ন, সংখ্যা আর চলরাশি দিয়ে তৈরি কোনও শর্ত লিখতে হয় IF শব্দটির পরে বন্ধনীর মধ্যে। শর্তটি সত্যি হলে যা করতে হবে তা লিখতে হয় এর ডান দিকে। যেমন :

```
IF (X+Y. GT. 100) Z = 0.0
I=10
```

বা IF (A. EQ. B.) GO TO 100

```
K = L + 5
```

দুটো সংখ্যার কোনটা বড় কোনটা ছোট ঠিক

```
READ (*, *) A. B
IF (A.GT.B) GO TO 10
WRITE (*, *) B
GO TO 20
10 WRITE (*, *) A
20 STOP
   END
```

বিন্যাস (অ্যারে) : একগুচ্ছ চলরাশিকে একসঙ্গে বিন্যাসের আকারে প্রকাশ করা যায়। একটি ক্লাসের সমস্ত ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে একটি বিন্যাস বলা যায়। রোল নম্বর দিয়ে প্রত্যেকটি একককে প্রকাশ করা যায়। SIX একটি বিন্যাসের নাম হলে SIX (10) বলতে ক্লাস সিক্সের রোল নম্বর 10 কে বোঝায়। কোনও অ্যারেতে মোট কতগুলি চলরাশি আছে তা DIMENSION বিবৃতি মারফত প্রোগ্রামের শুরুতেই বলে দিতে হয়। যেমন, মনে করো, ক্লাস সিক্সের ছেলেমেয়েরা যে চাঁদা দিয়েছে তার বিন্যাস SIX (I) বলে লেখা হল।

```
DIMENSION SIX (40)
I = 1
SUM = 0
10 READ (*, *) SIX (I)
SUM = SUM + SIX (I)
I= I + 1
IF (I. GT. 40) GO TO 20
GO TO 10
20 WRITE (6, 30) SUM
30 FORMAT (F 6.2)
STOP
END
```

SIX (I) নামে বিন্যাসটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রথমে DIMENSION SIX (40) বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হল SIX একটি বিন্যাস এবং এতে 40টি সদস্য আছে। এর পর I এবং SUM নামে দুটি চলরাশির মান জানানো হল অ্যাসাইনমেন্ট বিবৃতির মারফত। এর পর বিন্যাসের সদস্যদের দেওয়া চাঁদার পরিমাণ পড়ানো হতে লাগল I-এর মান এক-এক করে বাড়িয়ে। SUM চলরাশির মান প্রথমেই শূন্য ধরা হয়েছে—এর পর তার সঙ্গে বিন্যাসের সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ পর পর যোগ করে যাওয়া হল। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর নিয়ম অনুযায়ী SUM = **SUM** X (40) বলতে বোঝায় SUM চলরাশির বর্তমান মানের সঙ্গে **X (40)** এর মান জুড়লে যা হবে তা-ই জমা হবে SUM চলরাশির আগের মান সরিয়ে। X (40)র মান 5.0 হলে এবং SUM এর মান 10.0 হলে SUM চলরাশির নতুন মান হবে 15.0 এবং এর আগের মান 10.0 মুছে যাবে। একই ভাবে I=I+1 লেখা হয়েছে। GO TO 10 বিবৃতি I-এর মান বদলানোর সঙ্গে-সঙ্গে SIX (I) অ্যারের সদস্যদের চাঁদার যোগফল বের করার জন্য লেখা হয়েছে।

(সমাপ্ত)

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

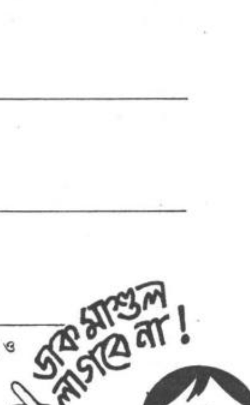

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

খেলাধুলো

পঞ্চম এশিয়াডে বাহাদুর

পর পর পাঁচবার এশিয়াডে যোগ দিতে যাচ্ছেন শটপাটার বাহাদুর সিং। আলোচনা করেছেন প্রবীর বসু

বাহাদুরই বটে ! তা না হলে টানা পাঁচটি এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া সহজ কথা ? এবারের বেজিং এশিয়াডে অংশ নিয়ে সেই অসাধারণ কৃতিত্বই দেখাতে চলেছেন বাহাদুর সিং চৌহান । গত চারটির মধ্যে তিনটি প্রতিযোগিতাতেই তাঁর পদক আছে শটপাটে, ২টি সোনা এবং ১টি রুপো । গত এশিয়ান গেমসে বাহাদুর চতুর্থ হয়েছিলেন, এবারেও পদক পাবেন কি না নিশ্চিত নয়,তা সত্ত্বেও এই পঁয়তাল্লিশ ছুঁই-ছুঁই বয়সেও যে অনায়াস দক্ষতায় যোগ্যতামান পেরিয়ে বেজিং যাচ্ছেন, তা তরুণদের কাছে আদর্শ হতে পারে । কুড়ি বছর ধরে নিজের দক্ষতাকে একটি নির্দিষ্ট মানে ক'জন ধরে রাখতে পারেন ?

অনেকেই ভেবেছিলেন বাহাদুর হয়তো এবার আর যোগ্যতামান অতিক্রম করতে পারবেন না । কিন্তু নয়া দিল্লির মাস্টার্স মিট বা এশিয়াডের ট্রায়ালে বাহাদুর প্রমাণ করলেন তিনি এখনও ভারতের অন্যতম সেরা শটপাটার । এশিয়াডের যোগ্যতামান ছিল ১৭·৭১ মিটার । বাহাদুর ১৮·০৭ মিটার দূরত্বে লোহার বল ছুঁড়ে এশিয়াডের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলে জায়গা করে নিলেন । বাহাদুরের শিষ্যের মতো, প্রায় কুড়ি বছরের ছোট এম· ভি· ঈশানও জাতীয় দলে নির্বাচিত হন । তিনি ছোঁড়েন ১৮·৩০ মিটার । বর্তমানের এশীয় মানেও বাহাদুর এখন পিছিয়ে, ঈশানও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু এসবে বিচলিত হওয়ার হওয়ার লোক নন বাহাদুর । তাঁর কথায়, "ঠিক সময়ে আমি প্রমাণ করব আমার দক্ষতা, আমার বাহাদুরি ।"

বাহাদুর হরিয়ানার এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারের সন্তান । বাবা কে· এম· চৌহানও খেলা ভালবাসতেন । নিজে কুস্তি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন । দুই ভাইয়ের মধ্যে বাহাদুর ছোট । বড় ভাইয়ের চাষবাসে আগ্রহ থাকলেও বাহাদুর কোনওদিনই ও-ব্যাপারে উৎসাহ দেখাননি, তাঁর সময় কাটত খেলাধুলো নিয়ে । বাহাদুরের সবচেয়ে বেশি পছন্দ ছিল ফুটবল খেলা, সঙ্গে ভলিবল, অ্যাথলেটিকস। স্কুলের গণ্ডি পার করে বাহাদুর ভর্তি হন জলন্ধর স্পোর্টস কলেজে । সেখানে

তাঁর খেলার আগ্রহ আরও বেড়ে যায় । কলেজের কোচ ঈশ্বর সিং বাহাদুরকে খুব পছন্দ করতেন । তিনি বাহাদুরের স্বাস্থ্য, পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে তাঁকে শটপাট এবং ডিসকাস থ্রোতে মন দিতে বলেন । ১৯৬১ সালে বাহাদুর প্রথম বড় ধরনের সাফল্য পান, ভূপালের সর্বভারতীয় স্কুল গেমসে, সেখানে শটপাটে রুপো জেতেন । ১৯৬৭-তে কোট্টায়ামের জাতীয় প্রতিযোগিতাতে শটপাটে সোনা জেতেন বাহাদুর । তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি বাহাদুরকে । ১৯৭৩-এ বাহাদুর ম্যানিলা যান এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে যোগ দিতে—সেখানে শটপাটে এবং ডিসকাস থ্রো দুটোতেই অংশ নেন তিনি । শটপাটে দ্বিতীয় হয়ে রুপো পান এবং ডিসকাস থ্রোতে চতুর্থ স্থান দখল করেন । প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হিসেবে এটিকে বড় ধরনের সাফল্যই বলতে হবে । এর পর শুরু হয় বাহাদুরের এশিয়াড অভিযান । ১৯৭৪ সালে তেহরান এশিয়ান গেমসে বাহাদুর শটপাটে রুপোর পদক জিতে আসেন, ডিসকাসে অল্প একটুর জন্য হাতছাড়া হয় ব্রোঞ্জ । চতুর্থ হন তিনি । পরের এশিয়াডেই বাহাদুর রুপোকে করে ফেলেন সোনা । দুর্দান্ত দক্ষতায় শটপাটে এশিয়ার এক নম্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন । বিরাশি সালে দিল্লি এশিয়াডেও বাহাদুরকে কেউ তাঁর জায়গা থেকে সরাতে পারেননি । শটপাটে আবার সোনা । সোল এশিয়াডে বাহাদুর অবশ্য নেমে যান চতুর্থ স্থানে । ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন বাহাদুর । এ ছাড়া অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন বাহাদুর ।

এতদিন ধরে ফর্ম ধরে রাখার রহস্য কী ? বাহাদুরের সপ্রতিভ উত্তর, "শারীরিক অনুশীলন এবং আন্তরিকতা ।" এই এশিয়াডের পরেই কি অবসর ? কথাটাকে তেমন গুরুত্বই দিলেন না টেলকোর স্পোর্টস অফিসার বাহাদুর সিং । অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, "আগামী এশিয়াডেও আমি যোগ দেব ।"

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

ইওকো গেরি

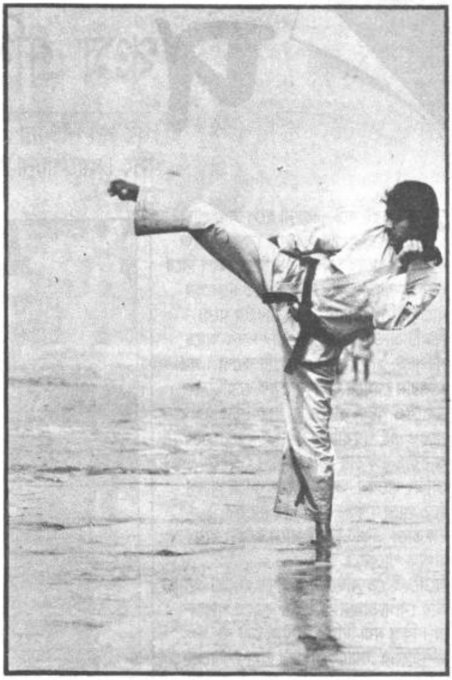

গত সংখ্যায় আমি কিওকুশিন ক্যারাটের পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে মারা বা আঘাত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। আগেই বলেছি যে, ক্যারাটেতে পা দিয়ে মারা বা মার আটকানোর পদ্ধতিগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পায়ের এই ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পা দিয়ে কোনও একটা জোরালো মার প্রতিপক্ষকে মারতে গেলে পায়ের সন্ধিস্থল ও পায়ের বিভিন্ন পেশীকে সবল করে তুলতে হবে অনুশীলনের মাধ্যমে। শক্ত সবল পায়ের গঠন না হলে পা দিয়ে আঘাত করে প্রতিপক্ষকে কাবু করা কঠিন। এবং হাত দিয়ে জোরালো মারের জন্যও শক্ত-সবল পায়ের দরকার। প্রথম অবস্থায় দৌড় এবং ডনবৈঠক পায়ের শক্ত সবল পেশী গঠনে সাহায্য করে। যাঁরা ক্যারাটের অনুশীলন করেন, তাঁরা পা দিয়ে আঘাত করার অনুশীলন শুরুর সঙ্গে বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন পায়ের পেশী গঠনের দিকে। আমি এইবার পা দিয়ে মারার যে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তার জাপানি ভাষায় নাম হল 'ইওকো গেরি'।

ইওকো গেরি : এই কথাটির অর্থ হল শরীরের দু'পাশে পা দিয়ে মারার পদ্ধতি। আগেই বলেছি যে, শুরুতে পা দিয়ে মারার পদ্ধতিগুলো সবই ইওইদাচি থেকে শুরু করতে হবে। প্রথমে ঠিকভাবে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর হাত দুটোকে মুঠো করে তুলে ওপরে এনে মুখটাকে আড়াল করে কান সমান উচ্চতায় ডান দিকে করে দাঁড়াতে হবে। এইবার ডান দিকে তাকিয়ে ডান পা হাঁটু থেকে মুড়ে ডান পাশে যতটা সম্ভব তুলে পায়ের পাতার বাইরের অংশ নীচের দিকে নামিয়ে টানটান করে ডান দিকে প্রতিপক্ষের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হবে। সেইসঙ্গে ডান হাত বাইরের দিকে নীচে নেমে আসবে। শরীরের ওপর ভাগ যখন ডান দিকে পা দিয়ে মারা হবে, তখন বাঁ দিকে একটু হেলে যাবে। কখনওই খুব বেশি হেলে যাওয়া ঠিক নয়। এইবার পা-টা ডান দিকে ছোঁড়া হয়ে গেলে তারপর আবার হাঁটু থেকে মুড়ে শুরুর অবস্থায় মাটিতে ফিরে আসবে। সেইসঙ্গে ডান হাত ওপরে উঠে এসে আবার শুরুর অবস্থায় ফিরে যাবে। এইবার ডান পা হয়ে গেলে, শরীরের ওপর ভাগ বাঁ দিকে একটু ঘুরে হাত দুটোও বাঁ দিকে করে মুখটা আড়াল করে দাঁড়াতে হবে। তারপর একইভাবে ডান পায়ের মতো বাঁ পা-টাকে বাঁ দিকে (কাল্পনিক) প্রতিপক্ষের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হবে। যখন বাঁ পা-টাকে ছোঁড়া হবে তখন শরীরের ওপরভাগ কোমর থেকে ডান দিকে কিছুটা হেলে যাবে। এইভাবে বাঁ পা হয়ে গেলে আবার ডান পা, তারপর আবার বাঁ পা দিয়ে প্রতি-পায়ে ১৫-২০ বার করে অনুশীলন করতে হবে। প্রথমে আস্তে-আস্তে অভ্যাস করে, তারপর গতি বাড়াতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে হাঁটুতে যেন ঝটকা না লাগে।

ফোটো : উৎপল সরকার

আহতের তালিকা বেড়ে যাওয়ায় রয় বাধ্য হয়ে প্রবীণ গোলকিপার টাবি মর্টনকে দলে এনেছে। কিন্তু টাইনকাস্টারের সঙ্গে খেলায় টাবি অনেক ভুল করেছে মনে হল। ভাগ্যক্রমে তুষারপাতের জন্য রেফারি খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। টাইনকাস্টার তখন এক গোলে জিতছিল…
তোমরা ভাগ্যবান, মেলচেস্টার! তুষার তোমাদের বাঁচিয়ে দিল!
তবে মর্টনের খেলা শেষ! আজকের খেলার পরে রয় ওকে বাদ দিতে বাধ্য!
রোভার্সের রয়
যদিও যৌবনে মর্টন ছিল এক অসাধারণ খেলোয়াড়! ক্লাবের সেবা ওর মতো এমন কেউ করেনি!
খেলাকেও এমন গৌরব আর কেউ এনে দেয়নি!
সত্যি কথা!
১৯৭২ সালে পোর্টডিনের বিরুদ্ধে সেই দুটি পেনাল্টি বাঁচাবার কথা মনে আছে?
আর ভাঙা হাত নিয়ে মেলবরোর বিরুদ্ধে সেই খেলার কথা!
আমরা কখনও তোমাকে ভুলব না, টাবি!
মর্টন! মঅঅর্টন!
অ্যাঁ?
হুর্‌রেএএ!
শাবাশ, টাবি!
আমি অভিভূত! এমন অভিনন্দন পাওয়ার মতো খেলেছি বলে কখনও ভাবিনি…
যখন সহানুভূতি আর প্রশংসার ধ্বনি ছড়াচ্ছে…
…কে মাথা ঘামায়? জনপ্রিয় হতে বেশ লাগে!
টাবি মর্টন জিন্দাবাদ টাবি মর্টন জিন্দাবাদ…
টাবি মেলচেস্টার ড্রেসিং-রুমে পৌঁছলে…
রয়, টাইনকাস্টারের সমর্থকদের প্রশংসা করতে হয়…। মানে, আমি মোটেই তেমন ভাল খেলিনি!
ইয়ে…ওরা তোমার খেলার বাহবা দিচ্ছিল মনে হয় না, টাবি…

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আনন্দমেলা
বাহাদুর প্রসাদ
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

আনন্দমেলা
লিম্বা রাম
ফোটো : জগদীশ যাদব

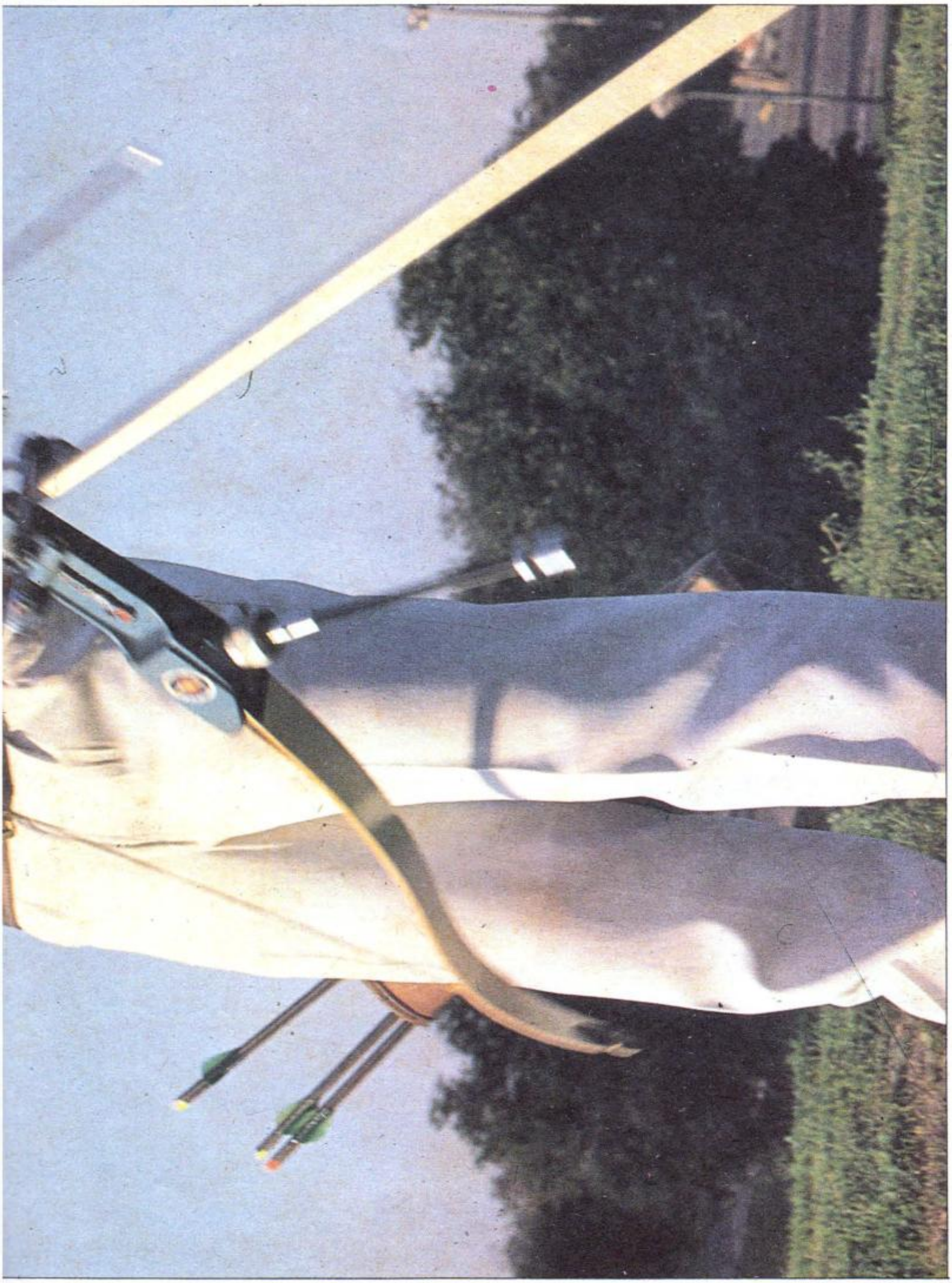

গল্প

রাজাকে নিয়ে মজা

বিকাশ বসু

সেই যে বিখ্যাত ব্রিজ—তিন ভাই, ভিক্টর, হেনরি, আর আইভান—তিনজনকেই হুবহু একরকম দেখতে, তাদের নিয়ে একটা গল্প লিখেছি। শুনবে ?

তার আগে মনে করিয়ে দিই, অবশ্য অনেকের হয়তো এমনিতেই মনে আছে, মনে থাকবার মতোই ব্যাপার। তিন ভাইয়ের তিন হুবহু একরকম চেহারা নিয়ে কত যে গোলমাল গণ্ডগোল—হেনরির অপরাধে আইভানের শাস্তি, আর ভিক্টরের পুরস্কার হেনরির প্রাপ্তি—এ তো লেগেই ছিল। তাই তো তারা বুদ্ধি করে—কী করল ?

দাড়ি রাখল, তিনজনে তিনরকম। গোঁফদাড়ি দিয়েই লেখা হয়ে গেল বা আঁকা হয়ে গেল প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর। অর্থাৎ, ভিক্টরের গোঁফ নিখুঁত পরিষ্কার কামানো। গোঁফ কামানো, কিন্তু দাড়ি আছে। দুই গালের দাড়ি এক ইঞ্চির মতো মোটা রেখায় দু' দিক থেকে নেমে এসে চিবুকে মিলেছে—মিলে তৈরি করেছে ইংরেজি বড় হাতের 'ভি'।

আইভানকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তার গোঁফ ভিক্টরের মতোই নিখুঁত কামানো। দাড়িও প্রায় তাই—শুধু থুতনির দাড়ি ঠোঁটের নিচ থেকে ঝুলছে ইংরেজি 'আই' অক্ষর হয়ে।

স্রেফ দাড়িগোঁফের সাহায্যে হেনরির নামের আদ্যক্ষর 'এইচ' বানাতে বেশ কিছু কায়দা-কসরত করতে হল, বুদ্ধিও খরচ করতে হল। ভিক্টরের মতোই হেনরিরও দুই গালের দাড়ি মোটা রেখায় নেমে এল চিবুক বরাবর—কিন্তু মিলল না, থেমে গেল মিলবার আগেই। অর্থাৎ চিবুকের মাঝখানটা রইল ফাঁকা। আর মোটা সরলরেখা আকারের গোঁফের ব্রিজ দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল তার দুই গালের দাড়ি—তৈরি হল ইংরেজি বড় হাতের এইচ।

আর কোনও গণ্ডগোল রইল না তিন ভাইকে নিয়ে। এমন চমৎকার ব্যবস্থায় সবাই খুব খুশি, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, এমনকী তারা নিজেরাও।

এখন এ তো গেল প্রায় ঐতিহাসিক ব্যাপার।

এর পর আমার গল্প।

এর পর এক মজার কাণ্ড ঘটল। আসলে কাণ্ডটি ঘটাল তিন ভাই মিলে। একদিন রাজার কাছ থেকে নেমন্তন্নর চিঠি পেয়ে হেনরি বলল, "এই ভিক্টর, আইভান, আয়, রাজাকে নিয়ে একটু মজা করি।"

ভিক্টর, আইভান প্রথমটায় ধরতেই পারল না হেনরি রাজাকে নিয়ে কী ধরনের মজা করার কথা ভাবছে। যদিও রাজা-রানি দু'জনেই তাদের তিন ভাইয়ের বিশেষ বন্ধু। প্রত্যেকটা পার্টিতেই তাদের নেমন্তন্ন হয়ে থাকে। তারা পার্টিতে যায়ও। আগে—যখন তাদের সাঙ্কেতিক পরিচয়বাহী (HIV) দাড়ি ছিল না, তখন পার্টিতে শুধু তাদের উপস্থিতিতেই রাজারানি খুব মজা পেতেন। রাজা ভুল করে তাদের একজনের ব্যাপার আর-একজনের ঘাড়ে চাপাতেন, আর রানি খিলখিল হাসতেন, হেসে লুটিয়ে পড়তেন। এখন আবার কী মজা করার কথা ভাবছে হেনরি।

হেনরি বলল, "শোন, দারুণ মজা হবে। যা করার করব আমি। তোরা শুধু এবার রাজবাড়ির পার্টিতে যাবি না। দাড়িগোঁফ কামিয়ে বাড়িতে বসে থাকবি। যাব শুধু আমি একা।"

ভিক্টর হেসে বলল, "এতে মজা হবে হেনরি শুধু তোরই। পার্টির মজা থেকে বাদ পড়ব আমরাই। আর তো কোনও মজা দেখছি না এর মধ্যে।"

আইভান বলল, "তার চেয়ে চল না, আমরা আবার তিনজনেই আগেকার মতো দাড়িগোঁফহীন হয়ে পার্টিতে যাই। তাতেই আবার হইহই পড়ে যাবে। রাজা আমাদের একজনের ব্যাপার আর-একজনের ঘাড়ে চাপাবেন, আর রানি খিলখিল হাসবেন, তাতেই মজা হবে বেশি। আগেকার সেই দিনগুলোই ছিল বেশি মজার, আমার তো তাই মনে হয়।

হেনরি বলল, "না রে, আমার মাথায় যে আইডিয়া এসেছে তাতে মজা হবে অনেক বেশি। দ্যাখ না রাজামশাইকে কেমন নাস্তানাবুদ করি।"

ভিক্টর বলল, "রাজাকে নাস্তানাবুদ? তার বিপদও তো আছে।"

হেনরি বলল, "একটুও না। নইলে আর মজা কিসের?"

হেনরি এবার উঠে গিয়ে ঘরের সব দরজা-জানলা ভাল করে এঁটে ফিরে এল টেবিলে। তারপর যথাসম্ভব খাটো গলায় দু' ভাইকে শোনাল তার রাজাকে নিয়ে মজা করার প্ল্যান।

প্ল্যান শুনে ভিক্টর লাফিয়ে উঠল, "দারুণ।"

আইভান বলল, "হেনরি, তুই একটা জিনিয়াস।"

হেনরি বলল, "তা হলে রাজামশাইকে তোরা রিগ্রেট লেটার পাঠাচ্ছিস। আইভান, তুই লিখে দে—তোর শরীর খারাপ। আর ভিক্টর, তোর অফিসের পরীক্ষার পড়া। এই কথা রইল। আর-একটা কথা, আমি পার্টিতে চলে যাওয়ার পরই তোরা কিন্তু দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলছিস। দাড়ি কামানোর সময়টা মোটামুটি এক হওয়া দরকার।"

হেনরিদের বন্ধু এই রাজার পার্টিতে রাজকীয় কিছু জাঁক অবশ্যই থাকে, কিন্তু জমকালো রকমের জগঝম্প কোনও ব্যাপার এ নয়। এজন্য তাদের তিন ভাইয়েরই রাজার পার্টি খুব ভাল লাগে। বাদ দেয় না একটাও। এবার ভিক্টর ও আইভান নিজেরা স্বেচ্ছায় বাদ পড়েছে। একজনের শরীর খারাপ, আর-একজনের পরীক্ষার পড়া। অন্তত সেইরকমই জানেন রাজামশাই।

যাই হোক, পার্টিতে এক ফাঁকে হেনরি জিজ্ঞেস করল রাজামশাইকে, "আপনার পুলিশপ্রধানকে দেখছি না কেন?"

"বোধ হয় কোনও কাজে আটকা পড়ে গেছে। সময় পেলে ঠিক এসে হাজির হবে। লোকটা খুব কাজের, বুঝলে।"

"হুঁ।" হেনরি চোখেমুখে অবিশ্বাসের হাসি ফোটাল।

"হাসলে যে।" রাজা বললেন।

"হাসলুম? ব্যাপারটা ঠিক উলটো বলে। আপনার পুলিশ ও গোয়েন্দা দফতর দুটোই কোনও কাজের নয়।"

"সে কী হে, এসব তুমি কী বলছ? তা হলে রাজত্ব চলছে কিসের জোরে।"

"ওরা না থাকলেও আপনার রাজত্ব যেমন চলছে, তেমনই চলত।"

রাজা অবাক হয়ে গেলেন হেনরির কথা শুনে। বললেন, "প্রমাণ দিতে পারো?"

"নিশ্চয়ই।"

"হাতে-কলমে?"

"হাতে-কলমে প্রমাণ চান? তা হলে আপনাকে আসতে হবে একটু নিরালায়।"

উৎসব হল ছেড়ে রাজা ও হেনরি চলে এল পাশের সাজানো-গোছানো বাগানে। বাগানের ভেতরেই একটু নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে এসে দাঁড়াল রাজামশাই ও হেনরি।

রাজামশাইয়ের চোখে-মুখে কৌতুক। বললেন, "কই হে হেনরি, এবার তোমার হাতে-কলমে প্রমাণ বের করো।"

"এই নিন।"

রাজাকে কিচ্ছুটি বুঝতে না দিয়ে হেনরি ঝট করে একটানে খুলে নিল তাঁর কোটের পকেটের ওপরে সারি দিয়ে সাজানো মেডেলের একটি।

রাজা দু-এক মিনিটের জন্য হলেও একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ওদিকে হেনরি আর সেখানে নেই। পকেট থেকে সাদা খামের এক চিঠি রাজামশাইয়ের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে পলকের মধ্যে সে হাওয়া।

হেনরির এরকম গাড়োয়ানি ইয়ার্কির মানে কী? হতচকিত রাজামশাই বাগানেই দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু এ নিয়ে কোনও হইচই বাধালেন না। এমন কিছুই করলেন না যাতে পার্টি ভেঙে যায়, বা উৎসবের মুড নষ্ট হয়। যেমন চলছিল পার্টি, তেমনই চলতে লাগল।

তাঁর চোখের সামনে ঘাসের ওপর পড়ে ছিল হেনরির ছুঁড়ে দেওয়া সাদা খাম। হেঁট হয়ে রাজামশাই কুড়িয়ে নিলেন সেটি। হেনরির চিঠি। হাসলেন, "কী লিখেছে সে, দেখা যাক।"

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় রাজামশাই,

হাতে-কলমে প্রমাণ দিতেই এই বেয়াদপি কাণ্ডটি ঘটাতে হল। বুঝতেই পারছেন এ আমার পরিকল্পিত, আবার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। অপরাধীকে ধরতে পারলে শাস্তি অবশ্যই সে মাথা পেতে নেবে। কিন্তু সে আপনি পারবেন না। আগেই বলেছি আপনার পুলিশ ও গোয়েন্দা দফতর কোনও কাজের নয়। চ্যালেঞ্জ রইল। তিন মাস সময় দেওয়া গেল আপনার ওই দুটি কাজের দফতরকে। কথা দিচ্ছি, এই সময়ের মধ্যে আমি আপনার এই রাজধানী শহর ছেড়ে কোথাও যাব না। আর তিন মাস পরে নিজেই স-মেডেল আপনার কাছে ধরা দেব। এবং আমার এই কৌতুকী অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেব। আশা করি তা পাব। নমস্কার। ইতি

আপনার
অশেষ প্রীতিধন্য
হেনরি

হেনরির চিঠি পড়ে রাজা স্মিত হাসলেন। ধীর পায়ে চলে এলেন উৎসব হল ছেড়ে পাশের ছোট ঘরে। শান্ত সংযত কণ্ঠে ফোন করলেন তাঁর পুলিশপ্রধানকে। সংক্ষেপে জানালেন সমস্ত ব্যাপারটা। এ-কথাও জানিয়ে দিলেন, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। শুধু হেনরিকে তিন মাসের মধ্যে তাঁর কাছে তাঁর খোয়া যাওয়া মেডেল সমেত হাজির করলেই হবে। সে যাবে কোথায় তার বিখ্যাত 'H' মার্কা দাড়ি নিয়ে? ধরে নেওয়া গেল সে দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলবে, কিন্তু তা হলেও সে ধরা পড়ে যাবে। সে বোধ হয় ভুলে গেছে তাদের তিন ভাইয়ের ঈশ্বরদত্ত চেহারার মিলের কথা—তার দাড়িওলা দু' ভাইয়ের পাশে তাকে দাঁড় করালেই প্রমাণ হয়ে যাবে, সে হেনরি না হয়ে যায় না। মোট কথা তার পালাবার পথ নেই, যদি না সে শহর ছেড়ে পালায়। তা সে পালাবে না, এই প্রতিশ্রুতি তো রাজাকে তার চিঠিতেই দিয়েছে লিখিতভাবে।

পুলিশপ্রধান রাজার বুদ্ধির তারিফ করলেন, অবশ্য এমন তিনি সুযোগ পেলেই করে থাকেন। আর এক্ষেত্রে তো সত্যিই রাজার হিসেব মোটামুটি নির্ভুল। পুলিশপ্রধান রাজাকে জানিয়ে দিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ রাতেই হেনরিকে স-মেডেল হাজির করছি আপনার সকাশে।

ফোন নামিয়ে রেখে মুখের বিব্রত ভাবের সবটুকু মুছে ফেলে সংযত পায়ে রাজা ফিরে এলেন নিমন্ত্রিতদের ভিড়ের মাঝে। কী ভাগ্যি তাঁর, অতিথিরা সবাই ছিল গল্পগুজবে ব্যস্ত। তাই কেউ লক্ষ করেননি হেনরিঘটিত ব্যাপারটা।

রানি শুধু বললেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমাকে সবাই খুঁজছেন।"

রাজা হেসে বললেন, "হেনরিকে বিদায় দিয়ে এলুম। আগেভাগেই বাড়ি চলে গেল সে। কী একটা জরুরি কাজ আছে নাকি?"

রানি রাজার কোটের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, "তোমার সেই পরম বীরচক্রের মেডেলটা দেখছি না কেন, যেটা গত যুদ্ধের পর তুমি পেয়েছিলে তোমার

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরাও আঁকো

গত সংখ্যায় যে আভাস ছিল, এবারে দ্যাখো আঁকার পাতায় তার চিত্ররূপ। তিনটি বিড়ালের ছবিতে ফুটে উঠেছে তিনরকমের ব্যঞ্জনা। এ ছাড়া অন্য কোনও বিড়ালের মুখের আদল কল্পনা করে তোমরাও এঁকে ফেলতে পারো!

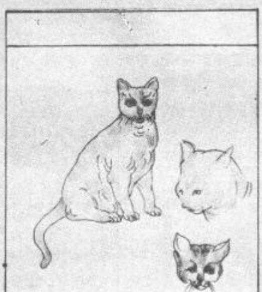

হাসিখুশি — শতদল

দিদিমণি ক্লাসে রচনা লিখতে দিয়েছিলেন—'এক কোটি টাকা পেলে তুমি কী করবে'। ক্লাসের সব ছেলে পাতার পর পাতা লিখে জমা দিল। শুধু বান্টি জমা দিল একখানা সাদা পাতা। দিদিমণি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন সে কিছুই লেখেনি, বান্টি উত্তর দিল, "এক কোটি টাকা পেলে কিছুই করতাম না, সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।"

★

"যদি এক আর একে দুই হয়, আর দুই আর দুই-এ চার হয় তা হলে চার আর চারে কত হবে?" দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন

ছাত্রটি বলল, "আপনি নিজে সব সোজাগুলোর উত্তর চটপট বলে ফেললেন আর সবচেয়ে কঠিনটা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন?"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বাবার হাত থেকে ?"

"ও সেটা ? সেটা স্ট্র্যাপে ঠিকমতো আঁটছিল না, তাই খুলে রেখেছি।"

ওদিকে রাজার ফোন পাওয়ার পর থেকেই পুলিশপ্রধান ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একটুও সময় নষ্ট করলে চলবে না। তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে, হাতের দরকারি কাজ ফেলে। ফোন করে জানিয়ে দিলেন শহরের প্রত্যেকটি থানাকে হেনরির মেডেল চুরি বা ডাকাতির ব্যাপারটা। তাকে বমাল ধরা চাই। কিন্তু গোপনে নিঃশব্দে—রাজামশাই এটাই চান।

নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পুলিশপ্রধান। প্রথমে হেনরির বাড়ি। সেখানে কি তাকে পাওয়া যাবে ? কী জানি, লোকটার সাহস বড় বেশি। হয়তো বা নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে বসে আছে, দাড়িটাড়ি সব ফেলে কাজের লোকের ছদ্মবেশে।

পুলিশপ্রধানের অনুমানে খুব বেশি ভুল হয়নি। হেনরিকে পাওয়া গেল তার বাড়িতেই। কিন্তু তখন তাকে আর চেনবার জো নেই। এদিকে আবার কাজের লোকের ছদ্মবেশেও সে নেই। সে পথ ধরলে তো তবু তাকে শনাক্ত করা কিছু সহজ হত।

ব্যাপারটা বেশ একটু অন্যরকম। আসলে হেনরি রাজবাড়ি থেকে সোজাসুজি বাড়ি ফিরে আসেনি। পথে সে পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য ঢুকেছিল প্রথম যে হেয়ার ড্রেসিং সেলুন পেয়েছিল, সেটাতেই।

সেখানে ঢুকেছিল দুটো উদ্দেশ্যে, রাজামশাই নিশ্চয়ই তাকে ধাওয়া করতে লোক পাঠাবেন—তাদের ফাঁকি দেওয়া যাবে সেলুনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে অন্তত কিছু সময়ের জন্য। এটা ছিল তার একটা উদ্দেশ্য। তার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল—দাড়িটা যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব কামিয়ে ফেলার।

এভাবে এক ঢিলে দু' পাখি মেরে সোজা পথে বাড়ি না ফিরে সেলুনের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অলিগলির পথে হেনরি বাড়ি ফিরে এসেছিল। তার ভয় ছিল রাজার লোক পথেই না তাকে পাকড়াও করে। একবার বাড়িতে এসে পৌঁছতে পারলে আর কী ভয় ? তারপর খেলাটা তো তার মুঠোয়। তারপর যতই সে পড়ুক না কেন রাজার লোকের সামনে, তাকে ধরে কে ?

যাই হোক, পুলিশপ্রধান আশা করেছিলেন, বাড়িতে পাওয়া যাবে না হেনরিকে, আর গেলেও, তখন সে থাকবে গোঁফদাড়ি কামিয়ে

কাজের লোকের ছদ্মবেশে। কিন্তু তিনি ব্যাপার দেখে হতবাক। একজন হেনরি নয়, তিন-তিনজন হেনরি টেবিল ঘিরে বসে আছে বাইরের ঘরে, যেন তাঁরই অপেক্ষায়।

অর্থাৎ তিন ভাইয়ের গোঁফদাড়ি নিখুঁত কামানো, তিনজনেরই মুখ হুবহু এক। আর তিনটি মুখেই একই রকম হাসি লেগে আছে। এবং প্রায় একসঙ্গে তিন ভাই সমস্বরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, "আসুন। আসুন।"

সাদর অভ্যর্থনা। কিন্তু পুলিশ সুপার ক্ষেপে গেলেন। এরকমটি যে ঘটবে, ঘটতে পারে তা তাঁর হিসেবের বাইরে, ধারণারও বাইরে। আচ্ছা ঠকান ঠকে গেছেন তিনি। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে টেবিলে থাবড়া মেরে বললেন, "তোমাদের মধ্যে হেনরি কে ?"

তিন ভাই একসঙ্গে উত্তর দিল, "আমি। আমি। আমি।"

রাগে ফেটে পড়লেন পুলিশসুপার, "বটে ? তোমাদের তিনজনকেই অ্যারেস্ট করলুম। চলো, রাজামশাইয়ের কাছে।"

হাসল তিন ভাই। এক ভাই বলল, "অত উত্তেজিত হবেন না মহাশয়।"

আর-এক ভাই বলল, "বড্ড হাঁপাচ্ছেন আপনি। আগে একটু বসুন তো। আমরা তো অ্যারেস্ট হয়েই আছি। তার আগে আপনি একটু রেস্ট নিন।"

আর-এক ভাই বলল, "আমি বলি কি, সবার আগে আপনি ফোন করুন রাজামশাইকে। তিনি আমাদের তিনজনকেই ধরে নিয়ে যেতে বলেন কি না সেটা জানুন।"

টেবিলে রাখা ফোনটা এগিয়েও দিল সে পুলিশপ্রধানের সামনে। তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁর সঙ্গেই ছিল ওয়াকিটকি। তিনি টেবিলের ফোনের দিকে একবার তাকালেন হেলা ভরে। তারপর ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ করলেন রাজামশাইয়ের সঙ্গে। তিন ভাই তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

ও-প্রান্ত থেকে রাজামশাই তাঁর নিজস্ব ওয়াকিটকি তুলে পুলিশপ্রধানকে বললেন, "সে কী হে ! একজন অপরাধীর জায়গায় তিনজনকে গ্রেফতার ? সেরকম কোনও আইন নেই। আর তাতে কি পুলিশ দফতরের মান খুব বাড়বে ? না রাজারই মান থাকবে ? আরে বাপু, আমার দরকার শুধু বিশল্যকরণীর, গোটা গন্ধমাদন নিয়ে আমি কী করব ? তিনজনের কাকে শাস্তি দেব ? নিরপরাধকে শাস্তি দিতে আমি পারব না।"

পুলিশপ্রধান বললেন, "তিন ভাই-ই একই সময় তাদের বহুদিনের রাখা দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলেছে, এই অপরাধে তিনজনকেই অ্যারেস্ট করা যায় না ?"

"এ কী কথা বলছ হে ? দাড়ি কামানোর

বা দাড়ি রাখা সে তো ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ব্যাপার। তাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে কী করে?" রাজা হাসলেন।

"তা হলে কি থার্ড ডিগ্রি দিয়ে দেখব?" মরিয়া হয়ে বললেন পুলিশপ্রধান।

"না, না, থার্ড ডিগ্রি নয়, আমার বন্ধুলোক এরা। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে খুঁজে বের করো হেনরিকে। সেটাই তোমাদের কাজ। নাঃ, পুলিশকে দিয়ে এ-কাজ হবে না। ডাকি গোয়েন্দা দফতরকে।"

পুলিশপ্রধান চলে গেলেন মুখ লাল করে। গোয়েন্দা দফতরের লোক আসছে শুনে তিন ভাই আরও সতর্ক হয়ে গেল। গোয়েন্দার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

ছোট হাত-আয়নায় একে-একে তিন ভাই পরীক্ষা করল তাদের গাল, চিবুক ও ঠোঁট। খুব ক্লোজ-আপ ভিউতেও দেখা গেল—ধরা পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তবু আর-এক প্রস্থ ক্রিম মেখে নিল সবাই। হেনরি বেশি করে ক্রিম ঘষল তার নাকের নীচে, যেখানে ছিল তার 'H' মার্কা দাড়ির ব্রিজ।

এর পর তারা একই স্টাইলে চুল আঁচড়ে নিল সবাই—যাতে একজন হয়ে উঠল আর-একজনের ছাঁচে ঢালা। দু'জন-দু'জন করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মুখ মিলিয়ে নিল তিন ভাই। আয়নার প্রতিবিম্ব দেখে যখন তাদের নিজেদেরই সন্দেহ হল কে কোন ভাই, তখন তারা হাসিমুখে আবার এসে বসল টেবিলে।

গোয়েন্দাপ্রধান এসে পৌঁছলেন হাসিমুখে। এসেই বললেন, "বাঃ, চমৎকার সেজেছেন তো আপনারা, ধরাছোঁয়ার বাইরে। আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বিশেষ করে, মিঃ হেনরি, আপনি—আপনাকে বলছি।"

মুখের ভাব গোপন করতে তিন ভাইই জোরে হাসতে লাগল। কোনও ভাইকেই হেনরি বলে শনাক্ত করার মতো কোনও আভাস ফুটল না তাদের কারও চোখেমুখে। গোয়েন্দাপ্রধানের প্রথম চালটা এভাবেই মারা গেল।

তবু হাসিমুখেই বললেন, "ডাকুন তো একবার আপনাদের কাজের লোকদের।"

টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টিপতে এক পরিচালক এসে দাঁড়াল। তাকে বলা হল, "তোমাদের সবাইকে ডাকো তো এখানে। যার যে কাজই থাক সবাই যেন আসে। বলবে, ডিটেকটিভবাবু ডাকছেন।"

একটু পরেই পরিচারকরা সবাই এসে দেওয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে দাঁড়াল। মোট পাঁচ-ছ'জন হবে।

"শোনো," গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, "আমি তোমাদের কয়েকটা সোজা প্রশ্ন করব। সোজা উত্তর দেবে। তোমরা সকলেই তোমাদের বাবুদের নাম নিশ্চয়ই জানো?"

"জানি। তা আর জানব না?" ইত্যাদি উত্তর শোনা গেল।

"বেশ। আমিও এঁদের নাম জানি। কিন্তু আমি এঁদের কাউকেই চিনি না। আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবে, কে কোন জন?"

পরিচারকদের কারও মুখে কোনও কথা নেই। সকলেই যেন তিন ভাইকে নতুন করে খুঁটিয়ে দেখছে। যেন এদের এই প্রথম দেখছে, এমন ভাবও ফুটল কারও-কারও মুখে।

গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, "কেন, তোমরা তোমাদের বাবুদের চেনো না?"

"চিনতুম। কিন্তু আজ সন্ধের পর থেকে আর চিনতে পারছি না।"

"চেষ্টা করে দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না।"

"চেষ্টার কি আর কসুর আছে বড়বাবু? আজ সনজে থেকে ঝা চলতিছে—। এর জল দিতি উরি দি। আপনি এট্টু থেকে দেখে যান বড়বাবু।"

একজন পরিচারক একেবারে হাউমাউ কেঁদে উঠল, "আমি আর এ গোলকধাঁধায় থাকব না, বাবু। কাজে জবাব দে চলে যাব, যেদিকে দু' চোখ যায়।"

"তোমাদের কেউই তা হলে তোমাদের বাবুদের চিনতে পারছ না। স্ট্রেঞ্জ। আচ্ছা, তোমাদের সবাই এখানে উপস্থিত আছ তো?"

"শুধু একজন বাদ। বুড়ো ক্যোচমান জ্যাক। এখন মোটর, স্কুটারের যুগ, পুরনো ল্যান্ডোটা পড়েই আছে অতীতের সাক্ষী হয়ে। এই বৃদ্ধও তাই। খুবই বৃদ্ধ, তাই তাঁকে আর ডাকা হয়নি।"

"সে কী! ডাকো, ডাকো তাঁকে। ধরে-ধরে নিয়ে এসো কেউ। তাঁকেই আমার চাই।"

অনেক কষ্ট করে একজনের কাঁধে ভর দিয়ে বৃদ্ধ জ্যাক এসে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীর কাঁপছে।

গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, "আপনাকে কষ্ট দিতে হল, সেজন্য মাফ করবেন। আচ্ছা, আপনি তো অনেক পুরনো লোক। এঁদের চিনতে পারছেন? বলুন তো কে কোন জন?"

বৃদ্ধ তাকালেন তিন ভাইয়ের দিকে।

"আপনার খুব চেনা লোক, ছোট বয়েস থেকে এদের দেখেছেন। বলুন বলুন, কারা এঁরা?"

এক মুখের থেকে আর মুখে ঘুরতে লাগল বৃদ্ধের চোখ, তারপর এক সময় তা গিয়ে স্থির হল দেওয়ালে টাঙানো এক অয়েল পেইন্টিং-এ।

"কী হল? বলুন।"

"কর্তাবাবুর পারা লাগছে।"

"কে, কর্তাবাবু কে ?"

"আমাদের বাবা। আমাদের বাবার কথা বলছে জ্যাক।"

"দেখুন, দেখুন, ভাল করে দেখুন। ভাল করে দেখলেই আপনি ঠিক চিনতে পারবেন, কে কোন জন ?"

"কর্তাবাবা।" বৃদ্ধের চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

"যাও, ওঁকে ওঁর ঘরে দিয়ে এসো কেউ।"

কাজের লোকদের সঙ্গে গোয়েন্দাপ্রধানের কাজ শেষ। তারা কেউ কোনও কাজের নয়। তারা যেতে পারে। দল বেঁধে তারা যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল দল বেঁধে।

এবার গোয়েন্দা ফিরলেন তিন ভাইয়ের দিকে। টেবিলে আঙুলের টোকা মারলেন কয়েকবার। তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল কথাটা সেইভাবে বললেন, "আচ্ছা, আপনারা ছবি-টবি তোলান না ? নতুন-পুরনো ছবি ! যা আছে আমাকে দিন।"

তিন ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল, "ছবি ? তায় নতুন, আবার পুরনো ?"

গোয়েন্দা বললেন, "হাঁ হাঁ, ঘরে যত ছবি আছে বের করুন। তাড়াতাড়ি করুন।"

এক ভাই উঠে গিয়ে ভেতরের ঘর থেকে দুটো ছবির অ্যালবাম এনে হাজির করল। সে দুটো বগলদাবা করে গোয়েন্দা বলল, "আর নেই ? এ দুটো আমি নিয়ে যাচ্ছি, ভয় নেই কাজ হয়ে গেলেই অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাবেন।"

চলে যেতে গিয়েও ফিরে এলেন গোয়েন্দা।

ব্যাগ খুলে ছবির অ্যালবাম দুটো তার ভেতরে চালান করে সেখান থেকেই বের করে আনলেন একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী ঝিলিকমারা ক্যামেরা। বললেন, "যেমন বসে আছেন, তেমনই থাকুন। আপনাদের এখনকার একটা ছবি নেব।"

ছবি নেওয়া হল। ক্যামেরা ব্যাগে পুরে গোয়েন্দা বললেন, "ফিরে যখন এলুম, তখন আপনাদের বাড়িটা একবার সার্চ করেই যাই। মিলিলেও মিলিতে পারে সেই সে রতন। কী বলেন ?"

যৎপরোনাস্তি সার্চ করা হল হেনরিদের বাড়ি। কিন্তু রাজার গ্যালান্ট্রি মেডেল পাওয়া গেল না।

গোয়েন্দা বললেন, "অনেক বিরক্ত করলুম আপনাদের। চলি। আবার দেখা হবে।"

এক মাস পরে তাঁর ছবি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ করে গোয়েন্দাপ্রধান ফিরে এলেন। ছবি পরীক্ষা করে তিনি কিছুটা আশান্বিত। হেনরির বাঁ দিকের গালে অতি ক্ষুদ্র একটি তিল আবিষ্কার করেছেন তিনি, পুরনো এক ছবি থেকে। অবশ্য তিলটি সত্যি-সত্যি তিল পরিমাণই, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। তা হোক। সেটাই হেনরিকে শনাক্ত করতে যথেষ্ট।

কিন্তু হেনরিদের বাড়ি এসে তিনি আবার মুষড়ে পড়লেন। এই এক মাস তিন ভাই চুপচাপ বসে নেই। এই সময়ের মধ্যে তারা তিন ভাই মোটামুটি রকমের দাড়ি গোঁফ গজিয়ে তিন মূর্তিমানের মতো বসে আছে।

বুদ্ধির খেলায় তিনি আবার পরাজিত। কিন্তু খেলার তো এখানেই শেষ নয়। রাজাকে ফোন করলেন গোয়েন্দাপ্রধান, "তিন ভাইকে গোঁফদাড়ি আবার কামিয়ে ফেলতে হুকুম করুন। তা হলেই আপনার হেনরি ধরা পড়বে। অপরাধী এখন আমার হাতের মঠোয়।"

এদিকে রাজামশাই খুবই ভাল রাজা। আর বোধ হয় গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারিও। তিনি জানালেন, সেরকম হুকুম তিনি করতে পারবেন না। গোঁফদাড়ি রাখা বা ফেলা মানুষের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ব্যাপার। সেখানে রাজার হস্তক্ষেপ করা চলে না।

এবার গোয়েন্দামশাইয়ের চোখেমুখে হতাশার ফিকে ছায়া পড়ল। হেনরির গালের সামান্য তিল ধরে এগিয়ে তিনি স্বয়ং হেনরিকেই ধরবেন, এই ছিল তাঁর বড় আশা। তা, তা আর হল না। তাঁর এক মাসের পরিশ্রম বৃথা গেল।

তবে এখনও আর-এক সূত্র তাঁর হাতে আছে। পুরনো একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে—আইভান ও ভিক্টরের তুলনায় হেনরি একটু মোটা। তিন ভাইয়ের মধ্যে যাকে তাঁর বেশি মোটা লাগল, গোয়েন্দা খপ করে তার হাতটা ধরে বললেন, "অতএব আপনাকে যদি হেনরি ধরে গ্রেফতার করি, আপনার কোনও আপত্তি আছে ?"

"একটুও না।"

গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতেই বুঝি গোয়েন্দাপ্রধান পুলিশ দফতরে ফোন করতে উঠলেন।

"আরে, আরে করছেন কী আপনি। কাকে গ্রেফতার করতে কাকে গ্রেফতার করছেন। ওর আপত্তি না থাকলেও আমার আপত্তি আছে ষোলো আনা, কেননা আমিই হেনরি। ও যেমন এই ক' বছরে মুটিয়েছে, আমি হেনরি তেমনই রোগা হয়েছি।

"ওরা দু'জনেই মিথ্যে কথা বলছে, এটা বুঝছেন না ? আসলে আমিই হেনরি, মোটা এক সময় ছিলুম বটে, ডায়েটিং করে আবার স্বাভাবিক হয়েছি। রোগাও নই, মোটাও নই। কেমন দেখছেন এখনকার হেনরিকে। ছবির সঙ্গে ভাল করে মিলিয়ে দেখুন, ঠিক ধরতে পারবেন।"

"নাঃ। আপনারা ভারী চালাক। বিশেষ

করে আপনি, মিঃ হেনরি। চালটা ভালই দিয়েছেন।"

"আমাকে বলছেন ?" এক ভাই বলল।

"দেখছিস আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।" আর-এক ভাই বলল।

"আরে বাপু, নাম ধরেই তো বললেন উনি। হেনরি, কার নাম আমাদের মধ্যে ? আমারই তো, না কি ?"

আর-এক ভাই হাসতে লাগল। গোয়েন্দা বুঝে নিলেন তিন ভাই শুধু যথেষ্ট বুদ্ধিই ধরে না, অভিনয়বিদ্যাও ভালই জানে।

কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। কেনই বা ছাড়বেন ? এখনও তাঁর হাতে দু' মাস সময় রয়েছে। দু' মিনিটে দুটো গোল হয়ে যায় ফুটবল খেলায়।

আবার আঙুল দিয়ে টেবিল বাজালেন তিনি দু-এক মিনিট। এরকম করলে বোধ হয় তাঁর বুদ্ধি খুলে যায়। হঠাৎই তিনি বললেন, "হয়েছে। এই কাগজটায় আপনারা তিনজনে সই করুন।"

এক টুকরো কাগজে একে-একে তিন ভাই সই করল—"হেনরি। হেনরি। হেনরি।"

ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করলেন গোয়েন্দাপ্রধান। কোনও তফাত নেই সই তিনটির মধ্যে। থাকবে কী করে ? প্রথমত, তিন ভাইই শৈশবে হস্তলিপি মকশ করেছে একই গভর্নেসের কাছে। দ্বিতীয়ত, এই এক মাস সময়ের তারা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। এই এক মাস ধরে ভিক্টর ও আইভান হেনরির হাতের লেখার নকল করেছে। তবু গোয়েন্দাপ্রধান সই-করা কাগজের টুকরো পকেটে পুরলেন। বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে—তাঁর চোখ আর হস্তলিপিবিশারদের চোখ তো এক নয়।

ক্ষীণ হলেও নতুন আশার আলোয় তাঁর চোখ ঝিকিয়ে উঠল, "চলি আজ। আবার দেখা হবে।"

গোয়েন্দামশাই আবার দেখা দিলেন ঠিক এক মাস পরে। এবারও মুখ থেকে তাঁর মার্কামারা হাসিটি মুছে যায়নি, তবে হাসিতে যেন সেই প্রাণ নেই। বিশেষজ্ঞরা তিন ভাইয়ের সই নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে তফাত যেটুকু আছে সই তিনটির মধ্যে তা ধর্তব্যের নয়। কেননা, একই মানুষের ভিন্ন-ভিন্ন সই-এর মধ্যে তা থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞরা নিজেরাই বিস্মিত হয়েছেন সই তিনটির অবিশ্বাস্য মিল লক্ষ করে। সম্ভবত তিন ভাই ত্রিজ বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সে যাই হোক, এই সূত্র ধরে আর এগিয়ে লাভ নেই।

গোয়েন্দা হেনরিদের বাড়িতে নিজেই চেয়ার টেনে বসতে-বসতে বললেন, "ধরেই নিতে পারেন, আপনারা জিতে গেছেন। তা হলেও আসুন, একটু গল্প-সল্প করা যাক।"

তিন ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল। তাদের চোখে প্রশ্ন ও বিস্ময়চিহ্ন। অর্থাৎ—গোয়েন্দা যখন গল্প করে—তখন ? হাঁ, সেই গল্পের মধ্যেও থাকে মতলব। অতএব সাবধান।

এ-কথা সে-কথার পর গোয়েন্দা বললেন, "আচ্ছা, আপনারা ডায়েরি লেখেন না ? নিশ্চয়ই লেখেন। দিন না আপনাদের ডায়েরিগুলো। একটু উলটেপালটে দেখি। কত মজার ঘটনা ঘটেছে আপনাদের একইরকম চেহারা নিয়ে। তা ছাড়া ডায়েরি এমনিতেই অতি উপাদেয় পাঠ্য।

এক ভাই বলল, "ডায়েরি ? ডায়েরি লিখব আমরা ? দুর মশাই, ডায়েরি লিখব আমাদের অত সময় কোথা ?"

"কেন, সময়ের আবার অভাব ? সময় নিয়ে করেন কী আপনারা ?"

আর-এক ভাই বলল, "কিছুই করি না। খাই-দাই নৃত্য করি মনের আনন্দে।"

"এই তো একটা বোকার মতো কথা বললেন। আপনি নিশ্চয়ই হেনরি নন ?"

তাঁর এই শেষ প্রশ্নটি কায়দা করে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলেন গোয়েন্দা, সেই ভাইয়ের দিকে। কিন্তু দেখা গেল—সেই ভাইটি গোয়েন্দামশাইয়ের অনুমানের চাইতেও চালাক। সে বলল, "এই তো গোয়েন্দামশাই, এখানেই আপনি বড় রকমের ভুল করে বসে আছেন। আপনি গোড়াতেই ধরে নিয়েছেন, হেনরি আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে চালাক। কে বললে আপনাকে তার আর দু' ভাই আরও চালাক নয় ?"

"ঠিক। আমারই ভুল হয়েছে। তবে কথাটা কিন্তু বোকার মতোই বলেছেন আপনি। কিছুই করেন না তো, চলে কী করে আপনাদের ?"

"কেন, শোনেননি ? টাউন মার্কেটে ছোট একটি লজেন্স-বিস্কুটের দোকান আছে আমাদের। তাতেই কোনওভাবে চলে যায়।"

"কোনওমতে চলে যায় ? তাতেই আধ-ডজন কাজের লোক পুষছেন বাড়িতে ?"

আর-এক ভাই বলল, "আরে শোনেন কেন ছেলেমানুষের কথা। আমার কাছ থেকে শুনে নিন। বেশ ভালভাবেই চলে টাউন মার্কেটের বিখ্যাত তিন দাড়িয়ালের দোকান। চলবে না ? বলতে গেলে সেটা একটা ট্যুরিস্ট স্পট। ভিড় লেগেই আছে। বলে, কত দূর-দূর থেকে খদ্দের আসে স্রেফ দোকানের মালিকদের দেখতে। তবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ই বেশি। তারাই আমাদের আসল লক্ষ্মী। নিজেরা আসে, বন্ধুদের ডেকে আনে।"

অন্য আর-এক ভাই বলল, "আমাদের দোকানের নাম Triplets Trivia. পুলিশের লোকরা বেশ ভালরকমই জানে। আপনি জানেন না ? চলে আসুন না একদিন আমাদের দোকানে। লজেন্স, টফির নেমন্তন্ন রইল।"

"যাব। আপনারা সবাই বসেন দোকানে ?"

"বসি।"

"তিন ভাই একসঙ্গে ?"

"ক্বচিৎ কখনও। পালাপার্বণে। সেদিন ট্রাফিক পুলিশের খাটুনি বেড়ে যায়।"

"অন্যদিন ?"

"পালা করে। সকাল, দুপুর, বিকেল—তিনবেলা তিনজন।"

"কে কখন বসেন ?"

"হেনরি কখন বসে, তাই জানতে চান তো ? ওইটি জিজ্ঞেস করবেন না। কখন কে বসে দোকানে তার কোনও ঠিক নেই। প্রত্যেকদিন সকালে সেটা ঠিক হয়।"

"অর্থাৎ, কে কখন দোকানে থাকবে সেটা বলতে রাজি নন। ঠিক আছে। আমি এখন উঠি।"

নিজের দফতরে না ফিরে গোয়েন্দা চলে এলেন টাউন মার্কেটে। 'ট্রিপলেট্স ট্রিভিয়া' তখনও খোলেনি কিন্তু পাশের রেস্তরাঁটা খুলেছে। ভালই হল—রেস্তরাঁয় বসেই খোঁজখবর যা নেওয়ার নেওয়া যাবে। এবং আরও ভালভাবে।

কেবিনে বসে বেয়ারার হাত দিয়ে নিজের নামলেখা কার্ড পাঠিয়ে দিলেন রেস্তরাঁর ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"আপনি তো অনেকদিন ধরেই ট্রিপলেট্স ট্রিভিয়ার তিন ভাইকে দেখছেন। ভাল করেই চেনেন ওদের।"

"হ্যাঁ, চিনি। পাশের দোকান তো। রোজই দেখছি।"

"হ্যাঁ, রোজই দেখছেন। সেইজন্যই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি ওদের রীতিমত চেনেন। চিনিয়ে দিতে পারবেন কে কোন জন ?"

ম্যানেজার বললেন, "এই তো মুশকিলে ফেললেন। কিছুদিন আগে হলেও পারতুম।

এখন আলাদা করে ওদের চেনা দুষ্কর। আবার তিনজনে একইরকম দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। দেখেননি ?"

এ-কথায় গোয়েন্দা আর কী বলবেন ? তিন ভাই যে আবার একইরকম দাড়ি রাখতে শুরু করেছে সে তো তাঁরই থাবা এড়াতে।

ম্যানেজার বললেন, "কী বলব আপনাকে, কী ঠকান যে ঠকছি আজকাল।"

"কীরকম ঠকছেন, একটু বলুন তো।"

"এই ধরুন, বললুম, কেমন আছ আইভান ? সে বলল, আপনার চোখ খারাপ হয়েছে ম্যানেজারবাবু। আমি আইভান নই, আমি হেনরি।"

"হেনরি !" লাফিয়ে উঠলেন গোয়েন্দা। এ-পথেও তো হেনরিকে একদিন পাকড়াও করা যেতে পারে। তিনি বললেন, "ঠিক আছে—আমি প্রায়ই আসব আপনার এখানে। থাকব ছদ্মবেশে। আমার সামনে আপনি ওদের ওই একই প্রশ্ন করবেন। মনে হচ্ছে তাতেই আমার কাজ হয়ে যাবে।"

এদিকে গোয়েন্দাপ্রধান হেনরিদের বাড়ি থেকে বেরোতেই ভিক্টর বলল, "ওরে আইভান, হেনরি, মনে হচ্ছে, গোয়েন্দামশাই ট্রিপলেটস ট্রিভিয়াতে আড়ি পাতবেন। হেনরি, তুই কিন্তু খুব সাবধান। কারও প্রশ্নেই তোর নিজের পরিচয় দিবি না। টাউন মার্কেটের আশেপাশে এখন তোর নাম—হয় ভিক্টর, নয় আইভান। অন্তত আগামী এক মাস।

এর পর একদিন টাউন মার্কেটের সেই রেস্তরাঁয় গোয়েন্দা রয়েছেন ছদ্মবেশে, হেনরি রেস্তরাঁয় খেতে ঢুকল। রেস্তরাঁর ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছ হেনরি ?"

হেনরি হাসল, "ভুল করছেন ম্যানেজারবাবু। আমি আইভান।"

আর-একদিন, সেদিনও গোয়েন্দা রয়েছেন ছদ্মবেশে, ম্যানেজার হেনরিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ আইভান ?"

"ভাল আছি।" অর্থাৎ নিজেকে আইভান বলে চালিয়ে দিল হেনরি।

আর-একদিন ম্যানেজার বললেন, "চলছে কেমন হেনরি ?"

হেনরি বললেন, "ম্যানেজারবাবু চশমা পালটান, আমি ভিক্টর।"

ম্যানেজার যেদিন জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ ভিক্টর ?"

হেনরি বলল, "শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।"

গোয়েন্দাপ্রধান জানিয়ে দিলেন রাজামশাইকে, "হার মেনেছি।"

এদিকে তিন মাস কাটতেই তিন ভাইয়ের নতুন সাজসজ্জা শুরু হয়ে গেল। এতদিন তারা যেন ছিল অজ্ঞাতবাসে। এবার সেই অজ্ঞাতবাস ভঙ্গ করার পালা। তার আগে নতুন করে পুরনো সাজসজ্জা, সঠিক অর্থে অবশ্য দাড়িসজ্জা।

পুরনো ছবির সঙ্গে মিলিয়ে আবার তিন ভাই দাড়িগোঁফের সাহায্যে নিজের নিজের পরিচয় ফুটিয়ে তুলল। ফিরে এল হেনরির 'H', ভিক্টরের 'V', আর আইভানের 'I'. এখন ছোট ছেলেটিও, যার সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে, সেও বলে দিতে পারবে—তিন ভাইয়ের কে কোন জন।

হেনরি ফোন করল রাজামশাইকে, "আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি। প্রস্তুত থাকবেন।"

রাজবাড়িতে পা দিতে দেখা গেল, শুধু রাজা নন, সঙ্গে রানিও এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন পোর্টিকোতে, বিজয়ী তিন ভাইকে অভ্যর্থনা করতে। অর্থাৎ রানিকে রাজা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন সব কিছু।

রাজা রসিকতা করলেন, "চোরের দেখা পাওয়া গেল, এখন চোরাই-ধনটি বের হলেই হয়।"

হেনরি হাসল, "চোরাই-ধনটি তো বরাবর আপনার হেফাজতেই আছে।"

রাজা-রানির চোখে বিস্ময়বোধক চিহ্ন, "সে কী !"

"আসুন আমার সঙ্গে।" সবাই হেনরির অনুসরণ করল। বারান্দায় উঠে হেনরি একটি বিশেষ ক্যাকটাস-টবের সামনে এসে দাঁড়াল।

"রানিজি, আপনি আসুন। টবের বালি সরান—সরান, সরান। আরও—আরও সরান—অ্যাই, পেয়েছেন কিছু ?"

"পেয়েছি। এই তো—এই তো গো সেই তোমার গ্যালান্ট্রি মেডেল। আশ্চর্য ! এখানে ছিল, অথচ..."

"তা হলে তো হেনরিকে ডবল পুরস্কার দিতে হয়। হেনরি, কী খেতে সবচেয়ে ভালবাস তুমি ?"

রানি বললেন, "জানি, জানি। আমাকে আর বলে দিতে হবে না। টকের ডাল, আর পোস্ত বড়া। তাই নয় হেনরি ?"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা : প্রাক-মৌর্য ও মৌর্য

দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন প্রাক-মৌর্য যুগেই হয়েছিল । লিখেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিন্ধ্য ও নর্মদা নদীর দক্ষিণে টাকার আবির্ভাবের তারিখ উত্তর-পশ্চিম বা উত্তরে এর প্রথম প্রচলনের সময়ের মতো পুরনো না হলেও তা নিশ্চয়ই প্রাক-মৌর্য যুগের । মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার ওয়াই বা বাইতে আবিষ্কৃত এক মুদ্রা ভাণ্ডারে কিছু রুপার মুদ্রা পাওয়া গেছে, যেগুলি ঢেলে দেওয়া গলানো মুদ্রাযোগ্য ধাতু একটু কঠিন হওয়ার সময় ছাপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে হয় । এই ছাপে একটি বড় বৃত্তের ভেতরে একটি ঘন বৃত্ত দেখা যায় । এর কাছে আরও দুটি ঘন বৃত্ত, এ দুটির প্রত্যেকটি দুটি সমান্তরাল রেখা দিয়ে বড় বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত । ছাপটি জোড় দিয়ে মারার ফলে তার চারপাশের ধাতু থালার কিনারার মতো একটু উঁচু হয়ে গেছে ।

মুদ্রাগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ছাঁচ চিহ্নিত আহত মুদ্রা তৈরির পদ্ধতি থেকেও অবৈজ্ঞানিক ও প্রাচীন । এইগুলি আলোচ্য অঞ্চলে মৌর্য যুগে ক্ষুদ্র ছাঁচ চিহ্নিত মুদ্রা প্রচলনের আগে চালু ছিল । তাই এগুলিকে প্রাক-মৌর্য যুগের মুদ্রা বলা যায় । খণ্ডগুলি ওজনের দিক থেকে কার্ষাপণের (৫৭·২ গ্রেনের) বা দক্ষিণ ভারতের কলঞ্জুর (৪৫-৫০ গ্রেনের) ওজনের সমান, অর্ধেক এবং একের চার ভাগ ।

কাছাকাছি কোঙ্কন অঞ্চলে কিছু ক্ষুদ্র ছাঁচে চিহ্নিত রুপার মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলির একদিকে ষাঁড় ও অন্য কয়েকটি ছবি এবং অন্যদিকে চারটি বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত ত্রিশূল ইত্যাদির ছাপ । এগুলির ওজন সাধারণত ১২·৮ গ্রেন । এগুলি শতমানের একের আট ভাগ বা কলঞ্জুর একের চার ভাগ মূল্যের হতে পারে ।

কোনও-কোনও পণ্ডিত পুরু পাতের ও চারটি ছাপ (এদের মধ্যে দুটি একই ছবির) বিশিষ্ট কিছু রুপার মুদ্রাকে প্রাচীন মূলক জনপদের টাকা বলে মনে করেন । এই জনপদ ছিল বর্তমান মহারাষ্ট্রের আউরাঙ্গাবাদ জেলা

দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত মৌর্য যুগের একটি রৌপ্য মুদ্রার রেখাচিত্র

অঞ্চলে । প্রতিষ্ঠানপুর (পৈঠান) ছিল এর রাজধানী ।

একদিকে ছোট চারটি ভিন্ন-ভিন্ন ছবির ছাপ (বা এদের মধ্যে দুটি একই ছবির ছাপ) সমেত কিছু খুব পাতলা পাতের রুপার মুদ্রা অন্ধ্র অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয় । এই প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার শিঙ্গবেরমে আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির কথা বলা যায় । এক হিসাব অনুযায়ী এগুলির সংখ্যা ৪০,০০০ । এগুলির গায়ে হাতি, লাঙল বাঁধা জোড়া বলদ, এবং বাঁকা চাঁদ ও সূর্যের কয়েকটি প্রতীকচিহ্ন বেষ্টিত এক বড় বৃত্তের

সাতারা জেলায় আবিষ্কৃত একটি রৌপ্য মুদ্রা । ছবির পাটা দিয়ে জোরে আঘাত করার ফলে ধাতব খণ্ডটির কিনারা উঁচু হয়ে গেছে

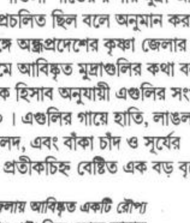

দুটি ছবি দেখা যায় । খুব পাতলা পাতের পেছন বা গৌণ দিক থেকে আঘাত করে মুখ্য দিকে উঁচুভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এইসব ছবি । এগুলির ওজন ২০ থেকে ৩০ গ্রেনের মধ্যে । এগুলিকে শতমান, কলঞ্জু বা কার্ষাপণের এক ভগ্নাংশ মূল্যের সমান বলে ধরা যেতে পারে ।

এক পিঠে কয়েকটি ক্ষুদ্র ছাপ বিশিষ্ট অল্প সংখ্যক সোনার খণ্ড এবং চারটি বিন্দু উৎকীর্ণ কিছু সোনার ও তামার পিণ্ডের কথা জানা আছে । প্রথম শ্রেণীর ওজন মোটামুটিভাবে ৫৮ গ্রেনের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সোনার পিণ্ডের ওজন সাধারণত ৫২ গ্রেনের । তামার পিণ্ডগুলির (১৬ থেকে ৬১ গ্রেনের) তৌলরীতি ঠিক বোঝা যায় না । এইসব খণ্ড ও পিণ্ডগুলি প্রাক-মৌর্য যুগের কি না সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । এগুলি অনেক পরবর্তীকালের হতে পারে ।

যাই হোক, অন্য মুদ্রাগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন প্রাক-মৌর্য যুগেই হয়েছিল । প্রথম যুগের মুদ্রারাজির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ছাঁচ বা পাটা চিহ্নিত মুদ্রাও ছিল ।

মুখ্য দিকে পাঁচটি ক্ষুদ্র ছাপ বিশিষ্ট এবং কার্ষাপণের তৌলরীতি অনুযায়ী ওজনের রুপার মুদ্রার বহুল প্রচলন হয় মৌর্য যুগে । দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকের একাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মৌর্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য । সুতরাং মৌর্যদের আমলে দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় আলোচ্য শ্রেণীর মুদ্রার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকা উচিত । প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় মুদ্রার বেশ কিছু ভাণ্ডারও আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় । এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার অমরাবতীতে বিখ্যাত প্রাচীন স্তূপের কাছে (মাত্র ২০ গজ দূরে) মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত এক মুদ্রা-ভাণ্ডার ।

(ক্রমশ)

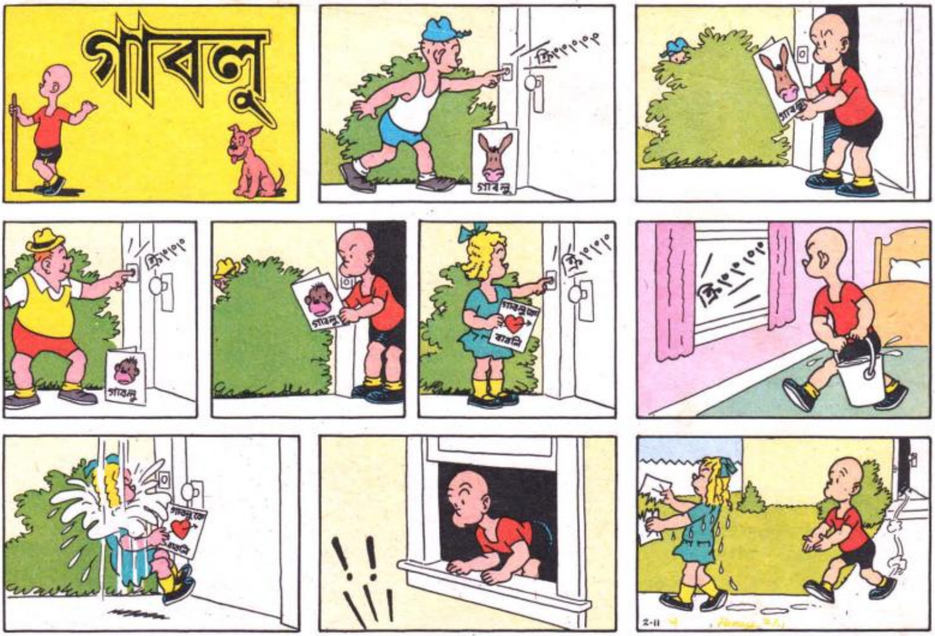
গাবলু
গাবলু

গাবলু
খাসা কাজ হয়েছে, বাছা!

ওখানে প্রতিযোগিতার শুরু । পাঁচ মাইল সাঁতার, তারপরে দশ মাইল দৌড় । এটা প্রথম পর্ব ।
জানি না কেন এটা করতে যাচ্ছেন ।
এই কারণে যে, ম্যাককালাঘের শরীর জিম উরুলুর দ্বিগুণ এবং মানুষকে তার কর্তব্য করতেই হবে ।
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
কথাটা কি ঠিক বলেনি ?
টারজান কুইন্সল্যান্ডের লৌহমানব প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে । যদিও আদিবাসী জিম উরুলু চাইছে টারজান যেন নিজেকে এই প্রতিযোগিতা থেকে দূরে রাখে···
লর্ড গ্রেস্টোক, আপনাকে বলেছি নিজের লড়াই নিজেই করতে চাই ।
এদের সবাইকে হারাতে চান, তাই না, জিম ?
মানুষকে তার কর্তব্য করতেই হবে ।
ব্রিসবেনে দেখা হবে ।
রায়ান, এরাই কি সেই বুদ্ধুর দল ?
হ্যাঁ, ডাডলি । এ আমার ভাই ডাডলি । আমি তোমাকে পছন্দ করি না, কিন্তু ডাডলি তোমার সাহসকে ঘেন্না করে ।
জিম, ট্রাকে ওরা দু'জন লোকের অনুমতি দেবে । আপনি আমার চেয়ে ভাল ড্রাইভার । আপনি কী বলেন ?
বলতে চাইছেন ট্রাক নির্জন অঞ্চলে পৌঁছলে রায়ান কোন ফিকির করবে কেউ জানে না ।
তৈরি হোন । আসল খেলা এখনও শুরু হয়নি ।
মনে থাকে যেন আইনকানুনের বালাই নেই !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ইস্কুলের ছুটি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

দিপুর জ্বর দিনচারেক ছিল। বাড়াবাড়ি কিছু নয়। আজ ভাত খেয়েছে। স্কুল খুলতে আর মাত্র ক'দিন। বোর্ডিংয়ে চলে গেলে আবার কবে আসবে কে জানে। পড়ার ক্ষতি হয় বলে, বউমা শনিবার-রবিবারেও দিপুকে বাড়ি আসতে দেন না। গিন্নিমা জোর করলে নিয়ে আসা হয় এক-আধবার।

দিপু চলে গেলে মহাদেব আবার একা হয়ে যায়। ছুটির ক'টা দিন ভরে রাখে ছেলেটা।

মহাদেব ভাবে, ঠাকুর এই বুড়ো বয়সে মায়া বাড়াও কেন? ঘরছাড়াকে আবার ঘরের দিকে টানো কেন?

একটু পরে কাজের মেয়ে দিপুকে কোলে করে নিয়ে এল। দুর্বল বলে হাঁটতে দেননি মা। বলল, "বউদি বলেছে, যাতে না ঘুমোয় দিপুবাবু।"

কিন্তু দিপুর এসেই দৌড়ঝাঁপ। কোথায় জ্বর থেকে উঠেছে, কোথায় দুর্বল, কোথায় কী! মহাদেবের ঘরে এলেই সব সেরে যায় দিপুর।

মহাদেব বলে, "জ্বর হয়েছিল। দুষ্টুমি তো কমেনি দেখছি।" মহাদেব দেখল, দিপু ঘুমোবার তালেই আছে। আসলে শরীর দুর্বল। বলে, "ভূতের গল্প জানিস?"

ভূতের নাম শুনেই দিপু বড়-বড় চোখ করে তাকায়। ভূতের নাম শুনলে ভয় লাগে, আবার ভাল লাগে। বলল, "তুমি ভূত দেখেছ মহাদেবদা?"

"শুধু দেখেছি কী রে, কথাও বলেছি, এই যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি।"

মহাদেব বুঝতে পারল ওষুধ ধরেছে। এই ভূতের গল্পেই ঘুমের দফারফা। বলল, "দিপু, সে কী যে-সে ভূত রে? একেবারে খোদ সাহেব-ভূত। টকটকে ফরসা গায়ের রং। গাঁক-গাঁক করে ইংরেজি বলে।"

দিপুর যেন বিশ্বাস হয় না, অন্তত এমনই ভাব দেখায়। বলে, "ধ্যাত, সাহেব ভূত আবার কী?"

মহাদেবও তাল দেয়। যেন সেও দিপুর সঙ্গে একমত। বলে, "আমারও সেই কথা। দেশ স্বাধীন হয়েছে তো। সাহেবরা আর সাহেব-ভূতরা জাহাজে চড়ে সব চলে গেছে বিলেতে।"

দিপু বলে, "তাদের নিশ্চয়ই কেউ যেতে বলেনি। তা গেছে যখন যাক। মিছিমিছি আমাদেব বনবাদাড়ে ভিড় করবে কেন। কিন্তু মহাদেবদা, যে-ভূতটা গাঁক-গাঁক করে ইংরেজিতে কথা বলেছিল, সে কী বলেছিল তুমি বুঝতে পারছিলে?".

মহাদেব আবার এক ফ্যাসাদে পড়ল। দিপুটার টনটনে পাকা বুদ্ধি। ঠিকই, সাহেবের ইংরেজি, সে বোঝার সাধ্যি মহাদেব বৈরাগীর বাবারও নেই। সে শুয়ে পড়ল তক্তপোশের ওপর তারপর ভেবে-ভেবে বলল, "শোন, সাহেব প্রথমে ইংরেজি বলে, আবার বাংলা তর্জমা করে দেয় তার। তবে জানিস সে বাংলাও ইংরেজির মতো। যা হোক করে ঠারেঠুরে বুঝে নিয়েছিলাম তখন।"

দিপু বলল, "আচ্ছা মহাদেবদা, সাহেব-ভূতটা ঠিক কীরকম করে কথা বলেছিল বলো তো? একটু শোনাও দেখি।"

মহাদেব কী বলবে বুঝতে পারে না।

দিপু অস্থির হয়ে ওঠে, "ও মহাদেবদা, বলো না। ঘুম পাচ্ছে আমার।"

মহাদেব বলে,"ঘুমোবি না। শোন, ভূত না হলে কি ভূতের মতো কথা বলা যায় রে বোকা! আগে ভূত হতে হবে, তারপর ভূতের মতো কথা বলা যাবে। জ্যান্ত মানুষ কখনও ভূতের মতো কথা বলতে পারে না। ভূতের কথা বলার কায়দাই আলাদা, গলার স্বর আলাদা, উচ্চারণও আলাদা। বুঝলি না?"

দিপু হঠাৎ বলে, "আচ্ছা মহাদেবদা, ভূতরা নাকিসুরে কথা বলে না?"

"ঠিক, ঠিক। ওইভাবেই বলেছিল। আর শেষের দিকে ব্যাটার গলা গাঁক-গাঁক করত না। আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আমাকে।"

"কোথায় থাকত সে? ইস্কুল বোর্ডিংয়ে?"

"না, না। সে বলল, কাঁসাই নদীর ধারে ওই যে একটা পোড়ো ভাঙা নীলকুঠি, 'আই স্টে দেয়ার' মিঃ বৈরাগী।"

"মানে?"

"মানে আমি ওই পোড়ো নীলকুঠিতেই থাকি বৈরাগীবাবু।"

দিপু বলে, "ওই নীলকুঠিতে? এমা! একা? ভয় করে না?"

"কী জানি ভাই। ভূতকে লোকে ভয় পায়। ভূত লোককে ভয় পায় কিনা জিজ্ঞেস করিনি।"

"একা থাকে কেন মহাদেবদা? বউ, ছেলেপুলে কেউ নেই? ভূতটাও তোমার মতো নাকি?"

মহাদেব বলে, "না, না, সব ছিল। কিন্তু এখন বড় একা। তা বলতে পারিস, কিছুটা আমার মতো।"

"কেন? মা, ঠাকুমা, বাবা, মহাদেবদা, তার কেউ নেই?"

তারপর দিপু কী ভাবতে-ভাবতে বলে, "ও বুঝেছি।"

মহাদেব একটু অবাক হয়ে বলে, "কী বুঝেছিস?"

"নিশ্চয়ই সাহেব কোনও পুতুল হারিয়ে ফেলেছে। বা গুলতি, বা মার্বেল। নইলে একা-একা পোড়ো নীলকুঠিতে ঘুরবে কেন? আজও খুঁজছে নিশ্চয়ই।"

মহাদেব বলে, "ও হ্যাঁ। ঠিক, মনে পড়েছে। সাহেব-ভূত বলল, তার পুতুল চলে গেছে কোথায়। আর ফিরে আসবে না।"

দিপুর আন্দাজ মিলে যেতে ভীষণ খুশি। তবু বলল, "ও মহাদেবদা, সাহেবের পুতুলটার কোনও নাম ছিল না? আমার পুতুলগুলোর কী সুন্দর-সুন্দর নাম ঠাকুমা দিয়েছে— এটা শিব, এটা কার্তিক, এটা কেষ্ট, এটা দুগ্‌গা।"

মহাদেব ভেবে-ভেবে বলে, "বলেছিল বটে, তার পুতুলের নাম ছিল 'পল'। বলতে বলতে সাহেব ভূতের গলাটা কেমন করুণ হয়ে গিয়েছিল।"

দিপুর বিশ্বাস হয় না, "পল! পুতুলের নাম পল? দুর, মহাদেবদা কী সব যে বলে, মাথামুণ্ডু থাকে না তার।"

"বাঃ, সাহেব-পুতুল যে!"

"ও, ওটাই হারিয়ে গিয়েছিল?"

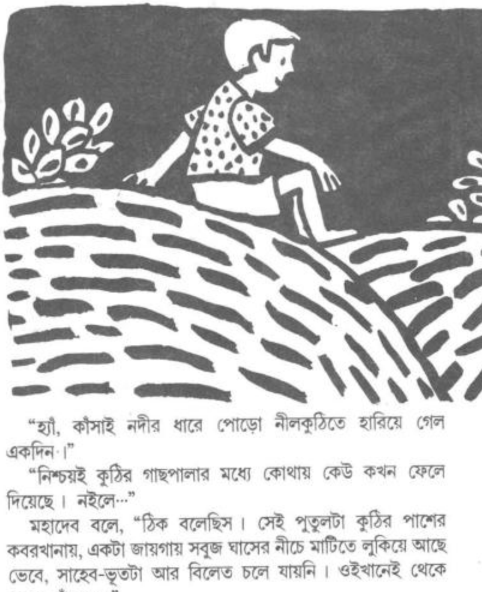

"হ্যাঁ, কাঁসাই নদীর ধারে পোড়ো নীলকুঠিতে হারিয়ে গেল একদিন।"

"নিশ্চয়ই কুঠির গাছপালার মধ্যে কোথায় কেউ কখন ফেলে দিয়েছে। নইলে…"

মহাদেব বলে, "ঠিক বলেছিস। সেই পুতুলটা কুঠির পাশের কবরখানায়, একটা জায়গায় সবুজ ঘাসের নীচে মাটিতে লুকিয়ে আছে ভেবে, সাহেব-ভূতটা আর বিলেত চলে যায়নি। ওইখানেই থেকে গেছে, খুঁজছে।"

দিপুর কেমন অবাক লাগে। একটা পুতুল, তার নাম পল, সেটা হারিয়ে গেল কবরখানার গাছপালা, ঘাসমাটির মধ্যে!

দিপু ভাবল, হতে পারে। পুতুল হারানোর দুঃখ, খেলনা হারানোর দুঃখ বা খেলনা ভাঙার দুঃখ যে কী, সে তা জানে। সে কতদিন খেলনাগুলো সুটকেস থেকে বের করে নিয়ে বসে, খেলে, তারপর একটা-একটা করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেই সব শেষ, তখন কান্না।

॥ ৬ ॥

ক'দিন পর খামারবাড়িতে ধান ঝাড়ানো হচ্ছিল।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে মহাদেব এসেছে। এবার ধান ভাগ হবে। ঝাড়ানো ধানের আঁটির ওপর মহাদেব বসেছে। কাছেই দিপু।

একজন চাষি দিপুর জন্য কাঠের একটা চেয়ার বৈঠকখানা থেকে নিয়ে এসেছিল। দিপু তাতে না বসে খড়ের ওপরেই বসেছে।

বউমা একবার দেখে গেলেন।

মহাদেব বুঝতে পারছে, এটা পছন্দ নয়। কিন্তু দিপু যে কথা শোনে না।

বাখারে ধান উঠবে, আদ্ধেক মালিকের, আদ্ধেক চাষির। ধান মাপতে-মাপতে বেলা গড়িয়ে যাবে।

গোপাল মাঝি ধান মাপা শুরু করল— রামে-রাম, দুয়ে-দুই, তিনে-তিন—।

দিপু অবাক হয় ধান মাপা দেখে। গোপাল মাঝি কেমন নামতার মতো করে সংখ্যাগুলো বলে যায়।

এমন সময়ে বুধন মাহাতোর বউ কুন্তী এসে দাঁড়াল।

মহাদেব ব্যাপারটা জানে। দু' বিঘে জমি চাষ করে বুধন মাহাতো। পর পর দু' বছর ফলন কম। তাই জমিটা ছাড়িয়ে নেওয়ার

আদেশ দিয়েছে খোকাবাবু। বুধন না এসে বউকে পাঠিয়েছে। বোধ হয় সাহস পায়নি।

মহাদেব ধান মাপের দিকে নজর রেখে বলল, "কুন্তী, মা-ঠাকরুনের কাছে গিয়ে বল।"

"আমি পারবনি। বাবুর হুকুম, ও নাকচ করতে পারে মা-ঠাকরুন।"

কুন্তী পা-দুটো জড়িয়ে ধরে মহাদেবের। আর কাঁদে। মুখে কিছু বলে না।

দিপু অবাক হয়ে যায়।

মহাদেব বলে, "আমার কি সেদিন আছে রে কুন্তী। কর্তাবাবু বেঁচে থাকলে, আমি পারতাম। সেদিন কে বলল, তুই, তোর ছেলেরা না খেয়ে থাকিস। বুধন দেখে না। বড় কষ্ট লাগল রে কুন্তী। যা, মাকে গিয়ে বল।"

বিকেল গড়িয়ে গেল। মালিকের ধান বাখারে তুলে দিয়ে চাষিরা নিজেদের ধান বইছে এখন।

মহাদেব ঘরে এল। একটু পরে কুন্তী এসে হাজির।

মহাদেব বলল, "মা-ঠাকরুন কী বলল রে?"

কুন্তী আধা-ঘোমটায় মুখ ঢেকে বলে, "মহাদেবকে বল। আমার শরীর ভাল নাই।"

মহাদেব একটা বড় ঝুঁকি নিল। বলল, "ঠিক আছে। এইটা শেষ বছর। বুধনকে ভাল করে চাষ করতে বলবি। যা, এই চাল, আর এই আধখানা বাঁধাকপি আছে, নিয়ে যা। বাচ্চাগুলোকে রান্না করে দিবি।"

দিপু ঘরের ভেতর তক্তপোশটায় বসে-বসে কী একটা গান আবোল-তাবোল করে গাইছে, তবু ভাল লাগছে। 'তোমার পতাকা যারে দাও/ তারে বহিবারে দাও শকতি'— কথাগুলো বড় ভাল লাগল মহাদেবের।

দিপুর গলাটিও ভারী মিষ্টি। আহা কী ভাব— তুমি পতাকা যাকে দেবে, বইবার ক্ষমতাও তাকে দেবে!

মহাদেব বলল, "এ গান কোথায় শিখলি রে দিপু?"

দিপু বলল, "আমার সুরটা হয়েছে মহাদেবদা?"

"বাঃ, এ গান কী আমি জানি? তবে বেশ লাগছে।"

দিপু খুশি হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। মহাদেবের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "আমাদের প্রার্থনার গান।"

"বড় ভাল গান রে দিপু। আমার পদ্য লেখার খাতায় গোটা গানটা লিখে দে। আমি মুখস্থ করে গাইব।"

দিপু ভীষণ খুশি। বলল, "পেনসিল কোথায়?"

"দ্যাখো, খাতার মধ্যে আছে।"

দিপু গুনগুন করতে-করতে গানটা লিখছে।

সন্ধে হয়ে আসছে। এবেলা রান্না নেই। কিন্তু এক বেলার রান্নাও তার ভাল লাগে না। উনুন ধরাতে হয়, সেও এক ঝামেলা। তরকারি কুটতে হয়। সেও বড় বিশ্রী ব্যাপার। মা-ঠাকরুন দুধ পাঠান, চালও পাঠান। মাঝে-মাঝে ঘি পাঠান। বলেছিলেন, "তুই আমার সঙ্গে খাস। আমিও মাছ-মাংস খাই না, তুইও খাস না।"

মহাদেব রাজি হয়নি। আসলে মুক্তি, নিজের মতো থাকা, নিজের মতো চলা—তার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সে তো গরিব, এক বিঘে জমি, আর খানিকটা পান-বরোজের 'জমিদার' ছিল সে এককালে! জাত ভবঘুরে। আগে ছিল যাত্রার দলে। তবে গান জানত বলে খাতির একটু ছিল বইকী! কিন্তু সে জীবনও যাযাবরের। মরসুমের সময় আজ এ-গাঁয়ে, কাল ও-গাঁয়ে। এই করেই কেটেছে কয়েক বছর।

কতদিন চলে গেছে এইভাবে। মহাদেব কোনও কষ্ট বোধ করেনি। পথে-পথে কোথা দিয়ে যে খাবার জুটে যেত। খাবার চিন্তাটা কোনওকালেই তার কাছে বড় নয়। বড় হল আনন্দ।

তারপর একদিন এই জমিদার-বাড়িতে এসে জুটে গেল মহাদেব। মাছ-মাংস খেত না। বাবুর পাল্লায় পড়ে খেল কিছুদিন। তারপর ছেড়ে দিয়েছে। কর্তাবাবুও বুঝতে পেরেছিলেন, বৈরাগীকে বাগে আনা যাবে না। জোর করলে একদিন পালিয়ে যাবে। তার চেয়ে ও নিজের খেয়ালখুশি মতোই থাকুক।

কর্তাবাবুর মৃত্যুর পরেও, মহাদেব কিছুদিন বাড়ির ভেতর খেত, যেমন গোমস্তারা খায়। কিন্তু কেন যেন আর মন চাইল না। একটু যেন অসম্মানের গন্ধ পেয়েছিল মহাদেব। রাজভোগ হলেও অসম্মানের অন্ন খেতে নাই ঠাকুর!

তাই বাবুর বাড়িতে খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে সে। লোকে জিজ্ঞেস করলে অন্য কথা বলে মহাদেব। যেমন, "না, বিশেষ কোনও গণ্ডগোল নয় গো। একে ওদের রান্নায় বড্ড তেল ঘি মসলা। তার ওপর কেমন একটা অধীনে থাকা। কর্তাবাবুর চলে যাওয়ার পর এটা হয়েছে।" বলে বটে, তবে জানে, এখন ভেতর বাড়ির ভার বউমার ওপর। তিনি কোনও এক অফিসারের মেয়ে, জমিদার পরিবারের নয়। বাবুর কলেজে পড়া যখন শেষ হয়ে আসছিল সেই সময়

শব্দসন্ধান রঞ্জন

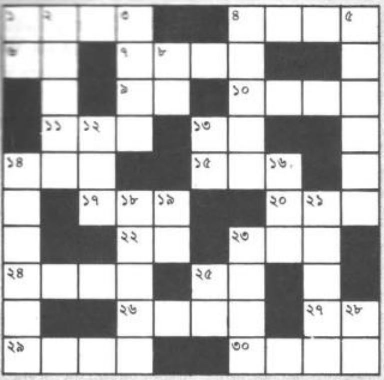

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) মানুষ নয় । (৪) 'মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল'— এখানে কোন কাব্যালঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে ? (৬) প্রথম পুরুষের একবচনে সম্মানিত ব্যক্তি । (৭) সুরভি, নন্দিনী প্রভৃতি । (৯) শিক্ষার বাহন । (১০) এক মুঘল-সম্রাট । (১১) অন্ধকারেই একে দেখা যায় । (১৩) বাংলা মতেও বারো, ইংরেজি মতেও বারো । (১৪) কাষ্ঠপাদুকা । (১৫) রুবিকের যা বিখ্যাত । (১৭) সমগ্র, সম্পূর্ণ । (২০) আপন বোধ । (২২) হাতি । (২৩) লেখক লেখেন, ইনি পড়েন । (২৪) অত্যন্ত ধারালো । (২৫) এরাই দেশের ভবিষ্যৎ । (২৬) নাটকে এটাই আসল । (২৭) পতাকা । (২৯) হই-হল্লা, গোলমাল । (৩০) ভাষান্তর ।

উপর-নীচ : (১)— দর্পে হত লঙ্কা । (২) দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু । এক পাখিও আছে এই নামে । (৩) তিরস্কার, ভর্ৎসনা । (৪) উপদেশ ; শিক্ষা ; আদেশ । (৫) ধৈর্য ; সহিষ্ণুতা । (৮) পাকা ধানে দিলেই ক্ষতি । (১২) পাঠশালায় পড়ুয়ারা একসঙ্গে সুর করে পড়ে । (১৩) এক সংস্কৃত কবি । (১৪) তত্ত্ব-তালাশ । (১৬) কচ্ছপ । (১৮) উপযুক্ত ; শোভন । (১৯) এর মুলুক মানেই অরাজক দেশ । (২১) কবিরাজি মহৌষধ । (২৩) শৈব । (২৫) 'এ যে দেখি জলে ভাসে —' । (২৮) 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা — ঐ' ।

গত সংখ্যার সমাধান

প	ন্ন	গ		আ	শি		গ	ঞ্জ	না
ক্ষি		তি	রো	ভা	ব		রি		ট্য
রা	গ	বি			রা		বি	পা	শা
জ	ল	ধি		য	ম	জ		থা	লা
			ক	ক্ষ		ন	জি	র	
	পা	হা	রা		গা	তা			
খ	ল		ত	ল	ব		ম	গ	জ
র	ক	ম		স্বো			হি	জ	ল
মু		স্থ		দ	ম	ক	ল		ধ
জ	স্থু	রা		র	তি		তা	তা	র

ভালবেসে বিয়ে ।

সেই সময় একদিন মহাদেব চাষের জমিতে কাজ দেখাশোনা করে বাড়ির ভেতরে জলখাবার খেতে এসেছে । দেরি হয়ে গেছে একটু । গাঁয়ের গোমস্তা সবাই খেয়ে চলে গেছে । খোকাবাবুর শোবার ঘরটা খাবার জায়গা থেকে খুব দূরে নয় । মহাদেব শুনতে পেল, খোকাবাবুর সঙ্গে বউমার ওই নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে ।

বউমা বললেন, "ওই মহাদেব লোকটা কে ?"

গলার স্বর তিক্ত, ঝাঁঝালো ।

বাবু বললে , "কাজের লোক । এ-বাড়িতে এমনই অনেকে থাকে, বাবার আমল থেকে ।"

"সবাই তো ওকে মাথায় তুলে রেখেছে যেন । এমন কথাবার্তা লোকটার যেন সে-ই বাড়ির মালিক । মা পর্যন্ত খাতির করেন ।"

"মহাদেবকাকা বড় ভাল লোক ।"

"ভাল হোক মন্দ হোক,কাজটা কী করে ? জমিদারি চলে যাচ্ছে । এত লোকের খরচ আসবে কোত্থেকে ? ওর খাওয়াপরা, মাসে পনেরো টাকা মাইনে । কত পড়ে একজনের পেছনে ? আর খায় কী ! একগাদা ভাত, সেইমতো ডাল-তরকারি ।"

বাবু অবাক হয়ে বলে, "কী বলছ যা-তা । এ বাড়িতে ভিখিরি পর্যন্ত না খেয়ে যায় না । এ বাড়ির রীতি এটা ।"

বউমার গলার স্বরে কী নিষ্ঠুরতা । বললেন, "ওসব নবাবি বাদ দাও ।"

"নবাবি ? তাই নাকি ? মহাদেবকাকার ওপর তোমার রাগ কেন বলো তো ?"

"কেন আর । লোকটা ভদ্রতা জানে না । তোমাকে তো গ্রাহ্য করে না দেখি । হঠাও ওকে । দূর করে দাও ।"

মহাদেবের মনে হল, মা-ধরিত্রী দ্বিধা হও । সে চলে যাবে কিনা ভাবছিল । এমন সময় কাজের মেয়ে কাঁসার থালাভর্তি মুড়ি-মুড়কি দিয়ে গেল । আর এক গ্লাস জল ।

মহাদেব বুঝতে পারছে না কী করবে । খিদে পাচ্ছিল । শেষ পর্যন্ত মহাদেব খেতে আরম্ভ করল ।

মা-ঠাকরুন ঠাকুরকে বকতে-বকতে সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন । হঠাৎ নজরে পড়ল, মহাদেব থালা থেকে মুঠো-মুঠো করে শুকনো মুড়ি খাচ্ছে ।

মা-ঠাকরুন দেখে সব বুঝতে পারেন । রান্নাঘর থেকে আধবাটি গরম দুধ এনে মহাদেবের পাতে ঢেলে দেন । বলেন, "তোকে শুকনো মুড়ি কে দিল রে । আমি কি মরে গেছি ? কাকে কি খেতে দিতে হয়, সব ভুলে গেল ?"

মহাদেবের গলায় দুধ-মুড়ি আটকে যায় । মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে, মা-ঠাকরুন তুমি চলে গেলে, তোমার এই ভবঘুরে ছেলে, একদিনও থাকবে না এখানে ।

এসব দেখতে-দেখতে কিছুদিন পরে মা-ঠাকরুনই একদিন বললেন, "মহাদেব, তুই আমার কাছে কাল থেকে খাবি । তুইও নিরিমিষ খাস । আমিও খাই । কী রে ? মনে থাকবে তো ?"

মহাদেব বড় গভীর স্নেহের ছোঁয়া পায় । কিন্তু মন চায় না । সে বলে, "মা, তোমার বড় দরদ আমার ওপর । কিন্তু একবেলা চাট্টি ফুটিয়ে নিলে আমার দু'বেলা চলে যাবে । কাঁহাতক ভেতর বাড়িতে এসে ঝামেলা করি । আমি রান্না করে খাব মা, তুমি অনুমতি দাও ।"

মা-ঠাকরুন চুপ করে কী ভাবেন । বোধহয় বউমার ব্যবহারের কথা । লোককে খেতে দেওয়ার সময় মা যেন অন্নপূর্ণা ।

"খা খা, পেট ভরে খা ।" মা-র যেন লোককে খাইয়ে আনন্দ ।

মহাদেব আলাদা খাওয়া শুরু করল।

মা মাঝে-মাঝে একটা জারে করে কিছুটা ঘি পাঠিয়ে দেন। দু-একদিন খাবার সময় এসেও পড়েন। মহাদেব বুঝতে পারে, কী খাচ্ছি না খাচ্ছি, মা-ঠাকরুন নিজের চোখে দেখে গেলেন। জমির কথাটা অজুহাত শুধু। মহাদেবের মনে কান্না জমে ওঠে। মা-ঠাকরুন, তুমি কি কোনওকালে সত্যি মহাদেব বৈরাগীর মা ছিলে!

প্রথম আসার সময়কার একটা ঘটনার কথা তার আজও মনে আছে। কী ব্যাপারে দু'জন কাজের মেয়ের একজন গেছে বাড়ি। আর-একজনের জ্বর। এ বাড়ির সবকিছু তখনও সে জানত না। তবে এটা বুঝতে পারত, রান্নার ঠাকুর তাকে পছন্দ করে না।

সেদিন একাই খেতে বসেছে মহাদেব। তা ঠাকুর একসময় এসে চুপিচুপি বলে গেল, "মহাদেব, আইজ এঁটো তুলিকি লই যব। কেউ ন অছি!"

খাওয়ার শেষে সবেমাত্র শূন্য কাঁসার বাটি দুটো থালায় তুলেছে মহাদেব, মা-ঠাকরুনের চোখে কী করে পড়ে গেল ব্যাপারটা। গৃহদেবতার পুজো শেষ করে নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন তখন।

বললেন, "ওটা কী হচ্ছে মহাদেব?"

গলার স্বর শুনেই মহাদেব বুঝতে পেরেছে, মা-ঠাকরুন রেগে গেছেন। সে একটু ইতস্তত করে বলল, "একজনের অসুখ। আর-একজন বাড়ি গেছে ছুটি নিয়ে। সেজন্য..."

"তাতে তোর কী? কে বলল তোকে এঁটো তুলতে? সেটা কে?"

মহাদেব চুপ করে থাকে। সে জানে এই ছোট্ট কথাটার মধ্যে কী আছে!

ধমকে উঠলেন মা-ঠাকরুন, "কী রে? কথা বলছিস না যে?"

মহাদেব জানে, মা-ঠাকরুন রেগে গেলে সামলানো বড় মুশকিল। কর্তাবাবু পর্যন্ত ভয় পেতেন।

কোথাকার খুব বড় জমিদার রায়সাহেবের মেয়ে। বড্ড তেজী। সেই যেবার পাশের জমিদারের লাঠিয়ালদের দশ বিঘা জমির ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার খবর এসেছিল, কর্তাবাবু ইতস্তত করছিলেন লাঠিয়াল পাঠাতে। লোক কম। মহাদেব শুনেছে, মা-ঠাকরুন রেগে বললেন, "ন্যায্য টাকা দিয়ে আমার নামে জমি কেনা। ধান আমার। অ্যাই, কে আছিস রে? ডাক তো নায়েবকে?"

বুড়ো নায়েব দেবেন পট্টনায়ক এসে দাঁড়াল হাতজোড় করে। বুঝতে পেরেছে, কর্তামা-র তলব। ও বড় কঠিন ঠাঁই।

কর্তাবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, মা-ঠাকরুন তাঁকে বললেন, "থামো তুমি।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "নায়েবমশাই, কোথাকার লাঠিয়াল?"

নায়েব ভয়ে ভয়ে বলে, "আজ্ঞে, শুনেছি মা, খড়্গপুর থেকে নিয়ে এসেছে ভাড়া করে।"

মা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "হুঁ, ক'জন?"

"আজ্ঞে, বেশি নয়, জনাআটেক। বোধ হয় জমিটার দখল নিতেই চায়।"

মা গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবেন। মুখ রাগে থমথমে। বললেন, "এখানে ক'জন লাঠিয়াল হাজির?"

নায়েব ভয় পেয়ে যায়। দাঙ্গা হবে বোধ হয়। বলল, "আজ্ঞে, তিনজন মফস্বলে গেছে। আছে পাঁচজন।"

"দরোয়ান অর্জুন সিং কোথায়?"

"সে আছে মা।"

"ডাকো।"

ইয়া লম্বা প্রকাণ্ড গোঁফ, মাথায় পাগড়ি অর্জুন সিং এসে মাথা

নুইয়ে প্রণাম করল। মা-ঠাকরুন মাথায় কাপড় টেনে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। গম্ভীর, নিচু গলা, তবু যেন হুঙ্কার। শুধু বললেন, "আটজন। পারবি?"

অর্জুন সিং তেলে পাকানো লাঠিটায় একবার মাথা ঠেকাল শুধু।

"জান লিবি, না হয় দিবি।"

অর্জুন সিং কথা বড় কম বলে। শুধু মাথা একদিকে হেলিয়ে বলে, "জি, সমঝা।"

"শোন। আগে তিনজন লড়বে। আড়ালে থাকবে দু'জন।"

অর্জুন সিং চোখ বন্ধ করে শুনছিল। বলল, "সমঝা মাইজি।"

"লাশ, লাশ চাই।"

অর্জুন সিং চোখ খুলল। "জি, হ্যাঁ।"

মা-ঠাকরুন তারপর ডাকলেন, "খোকা?"

বাবু তখন কলেজে পড়ে। ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়াল।

মা-ঠাকরুন বললেন, "নিয়ে আয় বন্দুক। দরকার হলে গুলি করবি। আমাদের ন্যায্য জমি। ওটা রাখতে হবে।"

মহাদেব যখন এখানে আসে, তার আগেকার ঘটনা এটা। তখনও এই দাঙ্গা, অর্জুন সিংহের মতো লড়াই, সব লোকের মুখে-মুখে ফিরছে। মাথা ফাটল কয়েকজনের। পাশের জমিদারের লাঠিয়ালরা কাটা ধান ফেলে আহত লোকগুলো নিয়ে পালায়। তবে খোকাবাবুকে গুলি চালাতে হয়নি। সে মামলা মেদিনীপুর সেশন থেকে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই হাইকোর্টে জিতে ফেরার সময়ই কর্তাবাবুর কাছ থেকে সুটকেসটা অসতর্ক মুহূর্তে কীভাবে পড়ে গিয়েছিল।

তখনও মা-ঠাকরুন দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠাকুর যেন ভয়ে কাঁপছে। মহাদেব এঁটো হাতে বসে আছে। কী করবে বুঝতে পারছে না।

মা-ঠাকরুন বললেন, "তুই জানিস, মহাদেব আমাকে মা বলে। তা আমার ছেলে বাড়িতে খেয়ে এঁটো তুলবে ? আমি কী মরে গেছি ? তুই না পারলে আমি এঁটো তুলব। তুই জানিস ? হতভাগা চুরি করে খাওয়া বামুন।"

বামুন-ঠাকুর একটিও কথা বলেনি।

মা-ঠাকরুন বললেন, "মহাদেব, যা, মুখ ধুতে যা।"

মহাদেব ভয়ে-ভয়ে চলে এসেছিল। তারপর সেদিন কে এঁটো তুলেছিল, তা সে জানে না।

দিপু ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "গানটা লেখা হয়ে গেছে মহাদেবদা।"

মহাদেব তার সেই বেঞ্চটায় বসে-বসে কত কী ভাবছিল। মাঠ থেকে, লাল মাটির রাস্তা থেকে শীতকালের রোদ কখন যে চলে গেছে, খেয়াল নেই।

এই এক আনন্দ মহাদেবের। সে নিজের মধ্যে ডুবে যেতে পারে। ওকে কী বলে ঠাকুর ? ধ্যান ?

দিপু খাতাটা নিয়ে এল। মহাদেব পড়ল কবিতাটা— একবার, দু'বার, তিনবার। আহা কী কথা গো ! 'তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস সহিবারে দাও ভকতি।' সেবার প্রয়াস। মহাদেব ভাবতে চেষ্টা করে, কথাটার মানে কী ! হ্যাঁ, কথাটা ঠিক মনে হয়। যখন সে পথে-পথে ঘুরছিল, তখন কী যে আনন্দ। অথচ চেষ্টাও ছিল তার সঙ্গে। সে চেষ্টা অন্য চেষ্টার সঙ্গে মেলে না। সেটা পবিত্র চেষ্টা। এখানে কবি বলছেন, 'মহৎ প্রয়াস'।

মহাদেব বলে, "দিপু, এইখানটা গা তো একটু।"

দিপু খুশিমনে গলা ছেড়ে গান গায়। মহাদেবও গায়, সঙ্গে-সঙ্গে বেঞ্চে ঠেকা দেয় !

একটু পরে গলায় সুরটা বসে যায়। মহাদেবের মনে হয়, গানের কাঠামোটি ধ্রুপদের। ভৈরবীর ওপর। বড় মধুর, বড় পবিত্র।

মহাদেব বলে, "দিপু, এবার এই লাইনটা গা।"

দিপু এখন রীতিমত গানের মাস্টার। মহাদেবদা তার কাছে গান শিখবে— দাদু যার গান শুনত, ঠাকুমা যার কাছে কীর্তন শুনত। বলল, "কোন লাইনটা মহাদেবদা ?"

"এই লাইনটা, 'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে।' বুঝলি রে দিপু, এ তোর মহাদেবদার একেবারে মনের কথা, জীবনে মৃত্যুর খাটিয়া বয়ে নিয়ে চলছি আমরা…"

দিপু বলে, "কী যে আবোলতাবোল বলো তুমি মহাদেবদা ?"

"সে হোক। তুই আবার গা। হ্যাঁ গলা ছেড়ে। আমি বেঞ্চের ওপর ঠেকা দিচ্ছি !"

সন্ধে হয়ে এল। চারদিকটা থমথম করে। পাতাঝরা নিমগাছটা একা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে !

॥ ৭ ॥

আজ হাটবার হলেও মহাদেব হাটে যায়নি। দিপুটা খুঁজে বেড়াবে। মহাদেবেরও দিপু কাছে না থাকলে ভাল লাগে না। বোর্ডিং থেকে কদ্দিন পরে এল। আবার চলে যাবে।

শীতের বিকেল। মহাদেব উঠবে-উঠবে করছে বিছানা থেকে। এমন সময় কাজের মেয়ে এল। সে বলল, "মা-ঠাকরুনের শরীর ভাল না। বিছানায় পড়ি রহিছন্তি। খোকাবাবু তাংকু জ্বালাতন করিছন্তি।"

মহাদেব বলল, "এখানে দিয়ে যাও। হাটে যাওয়া তো হল না। ভাবছিলাম দু-একজন চাষির বাড়ি যাব। ধানটান কবে ঝাড়াবে। তা, নিয়ে এসো ওকে।"

মহাদেব বিছানা থেকে উঠে গায়ে-দেওয়া কাঁথাটা ভাঁজ করে রাখল। পরে পাছে সময় না পায়, তাই ঘরটায় ঝাঁট দিল। বাগানটায় শুকনো পাতা জমেছিল কিছু। সেগুলো তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

কাজ করতে-করতে তার মনে হচ্ছিল, এই যে দিপু তার কাছে আসছে, বা তার নেওটা, এটাও বউমা পছন্দ করেন না। তা না করুন। মহাদেব আর ক'দিন এখানে। শুধু অবাক লাগে, খোকাবাবু কীভাবে এমন করে স্ত্রীর কথায় ওঠে-বসে ! মহাদেব ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

খোকাবাবু আজ সাতদিন মেদিনীপুর গেছে। মামলা চলছে চাষিদের মধ্যে। এর মধ্যে ফেরা উচিত ছিল। মহাদেব চায় না এ মামলা লড়তে। মহাদেব আর এই সব ঝামেলার মধ্যে থাকতে চায় না। তার হিসেব সোজা। অপরের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দেওয়া উচিত।

দূর থেকে দিপুর দৌড়ে আসার শব্দ আসে। বোধ হয় কাজের মেয়ে পেছনে-পেছনে আসছিল। দিপু ধমক দিচ্ছে তাকে, "যা, তুই যা। যা-না। বলছি, শুনতে পাচ্ছিস না ?"

মহাদেব মনে-মনে হাসে। এ যেন কর্তাবাবুর মেজাজ।

কর্তাবাবুর কথা মনে এলে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। কর্তাবাবু বলতেন, "মহাদেবটার বুদ্ধি আছে, বিষয়বুদ্ধি নেই।"

কুন্তী মাহাতো এসে দাঁড়াল।

মহাদেব বলল, "কী রে ? কী খবর ?"

কুন্তী ভয়ে-ভয়ে বলে, "ছোট ছেলেটার হাত-পা ফুলে গেছে। কী করবেক বাবু ?"

"জ্বর আছে ?"

"আছে গো।"

"ডাক্তার দেখা।"

মহাদেবের মনে হয়, না খেতে পেয়েই এই অসুখ। বড় কষ্ট লাগে তার। সেদিন চাল দিয়েছিল। কিন্তু হাঁড়িতে আজ বেশি চাল নেই। বউমা ওকে হিসেব করে চাল দেন এখন। আজ হাটে যাবে বলে পাঁচটা টাকা বের করে রেখেছিল সে। গামছাটা ছিঁড়ে গেছে। কিনতে হত।

মহাদেব বেঞ্চ থেকে উঠে ঘরের ভেতরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বের করে। তার বেতন ছিল মাসে পনেরো টাকা। এখন নেয় না। যে টাকা ছিল তা খরচ হয়ে যাচ্ছে। সে পাঁচ টাকার নোটটা কুন্তীকে দিয়ে বলে, "ওষুধ কিনিস। আর না সারলে, বুধনকে বলিস ঝাড়গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। হাত-পা ফোলা ভাল নয় রে।"

সরু-সরু হাতটা বাড়িয়ে কুন্তী টাকাটা নেয়।

মহাদেব বলে, "হাটে ডাঃ হরিপদ পাত্রের চেম্বার। পাশকরা ডাক্তার। তাঁকে দেখাবি। আমার কথা বলিস। ভিজিটটা ছেড়ে দেবেন।"

ডাঃ হরিপদ পাত্র এ-বাড়িতেও আসেন। সেই কর্তার আমল থেকে। মা-ঠাকরুনকেও দেখছেন।

কথা বলতে-বলতে দিপু হাজির। সেই লাল সোয়েটারটা গায়ে। জীবন্ত, চঞ্চল।

দিপু বলে, "ও মহাদেবদা, গোমড়া-মুখ করে বসে আছ কেন? জানো? ঠাকুমার শরীর আজ ভাল নেই।"

মহাদেব বলে, "দেখতে যাব। সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হোক। তা তুই, বোর্ডিংয়ে কবে যাবি রে?"

"বাপি মেদিনীপুর থেকে এলে। কেন?"

"মনে আছে? সেই যে নীলমণি জানা, যার ইংরেজি বই নেই বলে মার খায়, তাকে বই কিনতে দশটা টাকা দেব বলেছিলাম?"

"ও, বই, মানে বই আমি কিনে দেব।"

"টাকাটা বোর্ডিংয়ে যাওয়ার দিন নিয়ে যাস। ভুলে যাস না যেন।"

দিপু বলে, "তোমার এত টাকা মহাদেবদা?"

"দুর, টাকা কোথায়? পোস্টাপিসে কিছু ছিল। তুলে নিয়েছি। তোর দাদু আমাকে দশ বিঘে জমি, ঘরবাড়ি করে দেবেন বলেছিলেন। আবার বউ একটা জোগাড় করে দেবেনও বলেছিলেন।"

দিপু খুশি হয়ে বলে, "বেশ ভাল হত মহাদেবদা। আমি ঠাকুমা বলতাম। তখন তোমার গলা জড়িয়ে না ধরে বুড়ির গলা জড়িয়ে ধরতাম।"

মহাদেব হেসে বলে, "ওইজন্যই তো বিয়ে করিনি রে। তুই জ্বালাবি বলে।"

দিপুর বিশ্বাস হয় না কথাটা। আসলে মহাদেবদা ভবঘুরে। ঘর থাকলে আর ভবঘুরে হবে কেন! বলল, "ভবঘুরে কাকে বলে মহাদেবদা?"

"কাকে আর বলে, যে দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়।"

"ও, তোমার মতো?"

"আমি ভবঘুরে ছিলাম। এখন নয়। এই তো আমার ঘর এখন। দেখছিস না?"

"দুর! এ আবার একটা ঘর? ছিটে-বেড়ার দেওয়াল। তুমি বড্ড চালাক মহাদেবদা।"

মহাদেব একটু অবাক হয়ে যায়। দিপু এর মধ্যে চালাকির কী দেখল? বলল, "চালাক কেন রে?"

"কেন আর! আবার ভবঘুরে হবে বলে মাটির দেওয়াল-টেওয়াল দাওনি। মানে, ইচ্ছে হল ছেড়ে চললে। ব্যস। ফিরে তাকাবে না।"

মহাদেব আশ্চর্য হয়ে দিপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভগবান কি দিপুর মুখ দিয়ে এসব বলাচ্ছেন। সত্যি, তার মন এখন পথে-পথে ঘোরার জন্য আকুল হয়ে উঠছে! কিন্তু মা-ঠাকরুন এখনও আছেন। এ হয় না! অকৃতজ্ঞ হওয়া যায় না ঠাকুর! কর্তাবাবুর খেয়েছি, পরেছি। কিন্তু মন যে এখানে আর থাকতে চায় না। আর এই দিপুটা! বোর্ডিংয়ে এতদিন ছিল, মহাদেবের খারাপ লাগত, বড় খালি-খালি লাগত। এও যে মায়া ঠাকুর। এও বন্ধন। 'বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে/ মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে'—কিন্তু মুক্ত রাখতে পারছি না যে।

হঠাৎ দিপু বলে, "মহাদেবদা, আমি চলে গেলে তোমার খারাপ লাগে?"

মহাদেব বলে, "খারাপ লাগবে কেন রে? পড়াশোনা করতে হবে না। কত বড়-বড় ইংরেজি বই পড়বি, ইতিহাস পড়বি, বড়-বড় অঙ্ক কষবি! কত কিছু শিখবি রে! আমার মতো মুখ্যু হয়ে থাকবি নাকি! কত দেশ-বিদেশের গল্প, কবিতা..."

মহদেবদার ঘরের বাইরে এখন অন্ধকার হয়ে আসছে। শীতকালে অন্ধকারগুলো ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন এসে যায়!

দিপু বলল, "তোমার সেই পত্রিকাটা আসেনি?"

"কোন পত্রিকা?"

"ওই যেখানে কবিতা পাঠিয়েছ—'আনন্দনগর স্কুল পত্রিকা'। ওই বছরে একটা বেরোয়। দুর! তোমার যদি কিচ্ছু মনে থাকে!"

মহাদেবের মনে পড়ল। তাই তো, পত্রিকাটা এতদিনে আসার কথা। বার্ষিক উৎসব কবে হয়ে গেল। বলল, "এসে যাবে শিগ্‌গির, সময় হয়ে গেছে।"

দিপু পা থেকে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মহাদেবের বিছানায় শুয়ে পড়ে। এটাই ওর স্বভাব। হয় বেঞ্চে বসে রাস্তা দেখবে নয়তো তক্তপোশে শুয়ে গল্প শুনবে।

মহাদেব বলে, "তুই এসে আমার সব কাজ নষ্ট করলি। যে ক'দিন

থাকবি, কোনও কাজ করতে দিবি না।"

দিপু পা নাচায়। বলে, "আমি যে আসি, গল্প বলি তোমাকে, এটা শোনা তোমার কাজ নয় ?"

মহাদেব হাসে। ছেলেটার ভীষণ বুদ্ধি। কর্তাবাবুও বলতেন,'তুই থাকবি এখানে ভূমানন্দ। এই থাকাটাই তোর কাজ। কিন্তু তবু মহাদেব অনেক অনেক কাজ করত এস্টেটের !'

কিন্তু মহাদেব বলত, 'এর জন্যও বেতন ?'

'আলবাত বেতন। তুই ব্যাটা একটা খাঁটি সাধু। সাধুসঙ্গ করতে হলে প্রণামী দিতে হয়। জানিস না ?'

মহাদেব জিভ কেটে বলে 'কী যে বলেন কর্তা। এসব শুনলেও পাপ।'

কর্তাবাবু হাসতে-হাসতে বলেন, 'গোমস্তা দেবেন পট্টনায়েকের বাড়ি দেখেছিস ? পাকাবাড়ি। বেতন কত পায় জানিস্ ? আর তুই ?'

তা, থাকাটাই কাজ। হতে পারে। তবে মহাদেবের ক্ষেত্রে তা কেন হবে ? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কাজের মধ্যে ছিল অর্জুনের রথটা চালানো। সে তো যে-কোনও সারথি চালাতে পারত। শ্রীকৃষ্ণের দরকার হয়েছিল কেন ? হয়েছিল, ওই থাকাটাই কাজ বলে।

মহাদেব কর্তাবাবুকে কিছু-কিছু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে কখনও-কখনও। এটা ঠিক। যেমন, অন্যায় মামলা করতে নিষেধ করেছে, গোমস্তারা যা করতে বলত। তাতে ওদের দুটো পয়সা আসে। মহাদেব বলত, 'কর্তা, ওটা অধর্ম। কাউকে ভিটেমাটি ছাড়ানো পাপ। আজ খাজনা দিতে পারছে না। দু'দিন পরে দেবে। আপনার এতবড় জমিদারি ! খাজনার টাকাটা সমুদ্রে জলবিন্দু, কর্তা !' কর্তা বলতেন, 'বেশ বলেছিস তো রে। কে আছিস দেবেনকে ডাক তো ?' দেবেন এলে বললেন, 'ও বাকি খাজনার মামলাটা থাক, দেবেন।'

আবার কর্তাবাবুর ক্ষতিও হয়েছে কখনও-কখনও।

দিপু রেগে যায়। "ও মহাদেবদা, বোর্ডিং থেকে এসে দেখছি, তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। এখানে থাকো, আবার এখানে থাকো না।"

মহাদেব সচেতন হয়। সত্যি, আজকাল এই রোগটা বড্ড বেড়েছে। সে এখান থেকে বেরিয়ে তার সেই চল্লিশ বছর আগের ঘরছাড়া জীবনে ঘন-ঘন ফিরে যাচ্ছে।

দিপু গুনগুন করে ওই গানটা গায়, 'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে।' মহাদেব কান পেতে শোনে। গতকাল না পরশু দিপু খাতায় লিখে দিয়ে গেছে গানটা। মহাদেব সুরটাও শিখে নিয়েছে।

হঠাৎ দিপু বলে, "ইংরেজির সার সেই যে গল্পটা বলেছিল..."

"হ্যাঁ, গল্পটা কী ?"

দিপু বলে, "মহাদেবদা, তুমি দৈত্য দেখেছ ?"

মহাদেব বলে, "না, কোথায় দেখব ?"

"আমি কিন্তু দেখেছি।"

মহাদেব যেন অবাক হয়েছে ! বলে, "তাই নাকি ? কোথায় দেখা হল তোর সঙ্গে রে ?"

"ইংরেজির সারের বইতে দেখেছি।" সার ওই দৈত্যের গল্পটা বলেছিলেন, কী সুন্দর না ? তুমি শুনবে ?"

"শুনতে পারি। কিন্তু দ্যাখ, আঙুরের মতো আমাকে আবার টপাটপ গিলে-টিলে ফেলবে না তো ?"

দিপু সাহস দেয়। সে বলে, "ওরা, জানো, বড়দের কিচ্ছুটি বলে না। শুধু বাচ্চাদের..."

মহাদেব বলল, "ইংরেজির সার যে দৈত্যের কথা বলেছিলেন, সে দৈত্যটা কি ছেলে ধরে-ধরে খেত ?"

দিপুর মনে পড়ে যায় গল্পটা। বলল, "না, না, সে তো একদম বুড়ো।"

মহাদেব বলল, "তুই এলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। এই যে ধান ঝাড়ানোর কথা বলতে যাব, আলু তোলার কথা বলতে যাব, বড় দিঘিটা পরিষ্কার করার কথা বলতে যাব, এসব হচ্ছে না। সে হোক। তোর দৈত্য কী কাণ্ড করল শুনি ?"

॥ ৮ ॥

ঘরের বাইরে উত্তুরে হাওয়া বইছে। অমাবস্যা পক্ষের রাত্রি। সন্ধে হতে-না-হতেই গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ বাসটা চলে যাওয়ার পর আরও নির্জীব হয়ে পড়ে এই অঞ্চলটা।

মহাদেব বলে, "দিপু, কই রে, তোর সেই দৈত্যের গল্পের কী হল ?"

দিপু বলে, "শোনো, সে দৈত্যের একটা খুব বড় ফল-ফুলের বাগান ছিল। আর দৈত্যটা ছিল বড্ড কিপ্টে। হিংসুটে। তা ইস্কুল থেকে ফেরার সময় ছেলেগুলো দল বেঁধে তার বাগানে ঢুকত, ফলটল খেত, গাছের ডালপালা ভেঙে নষ্ট করত। আসলে ভীষণ দুষ্টু ছেলে তো সব।"

"যা বলেছিস। ঠিক তোর মতো।"

"বাঃ, আমি দুষ্টু নাকি ?"

"না, না, খুব শান্ত। শুধু মহাদেবদাকে জ্বালাস। সে হোক, তারপর দৈত্যটা কী করল ?"

দিপু মনে-মনে গল্পটা সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তারপর বলে, "দৈত্যটা সেবার তার এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। ছিলও অনেকদিন। দৈত্যের বন্ধু নিশ্চয়ই সেও দৈত্য, না মহাদেবদা ?"

"কী করে জানব ? দৈত্যটা তো আমাকে বলেনি।"

"শোনো। দৈত্যটা তখন রেগে বাগানের চারদিকে খুব উঁচু করে পাঁচিল গেঁথে দিল। তারপর গেটের কাছে একটা কাগজে খুব

বড়-বড় করে লিখে দিল 'খবর্দার। ভেতরে ঢুকিলে আদালতে সোপর্দ করা হইবেক।' মানে জেলে ঢুকিয়ে দেবে।"

মহাদেব বলে, "ও, দৈত্যটা মামলা-টামলা করতে জানত।"

"আচ্ছা মহাদেবদা, দাদু নাকি খুব মামলা করত?"

"করতেন। তবে আমি আসার পর অনেক কম। তা হোক। তুই বল, দুষ্টু ছেলেগুলো তো দৌড়ে পালাল। তারপর পাঁচিল গেঁথে নোটিস।"

দিপু একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে, "কিন্তু মহাদেবদা, বাচ্চা ছেলেগুলোর আর খেলার জায়গা কোথাও ছিল না। কিন্তু বাগান তো পাঁচিল ঘেরা। আর গেটের কাছে ওই যে নোটিস। তাই ভয়ে ওরা বাগানে যেত না। শুধু রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে সময় কাটাত।"

মহাদেব হেসে বলে, "বুঝেছি। তোর মতো। বন্ধু-টন্ধু নেই। মহাদেবদার ঘরে যেমন পড়ে থাকিস সব সময়। তারপর?"

"তুমি একটুও মন দিয়ে শুনছ না মহাদেবদা। বাচ্চাগুলো যে না খেলতে পেয়ে মুখ শুকনো করে ঘুরছে, তুমি সেটা বুঝতেই পারছ না।"

মহাদেব দিপুর গম্ভীর মুখের দিকে তাকায়। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় কেমন যেন লাগে।

কারা রাস্তা দিয়ে কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে। সে কথাগুলোর শব্দ একটু পরে আর শোনা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

মহাদেব বলে, "আমি সত্যি-সত্যি মন দিয়ে শুনছি রে। তুই বলে যা।"

দিপু গম্ভীর হয়ে বলে, "ক'দিন পরে বসন্তকাল এল। চারদিকের গাছে কত ফুল। কোকিলগুলো এসে মিষ্টি সুরে গান গাইছে। কিন্তু সেই বুড়ো দৈত্যের বাগানে ফুলও ফুটল না। কোকিলও গান করল না। সেখানে তখনও শীত, পাতা ঝরছে, কনকনে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বইছে। দৈত্য-বুড়ো ভাবল, বোধ হয় এ-বছর বসন্ত আসতে দেরি করছে। তা একদিন বুড়ো দৈত্য শুনতে পেল, তার বাগানের কোণের একটা গাছে, একটা কোকিল বসে 'কুহুকুহু' ডাকছে। বুড়োর মনে হল, আঃ কী মিষ্টি সুর। হ্যাঁ, বসন্ত এসেছে এতদিনে। যাক, বাগানটা

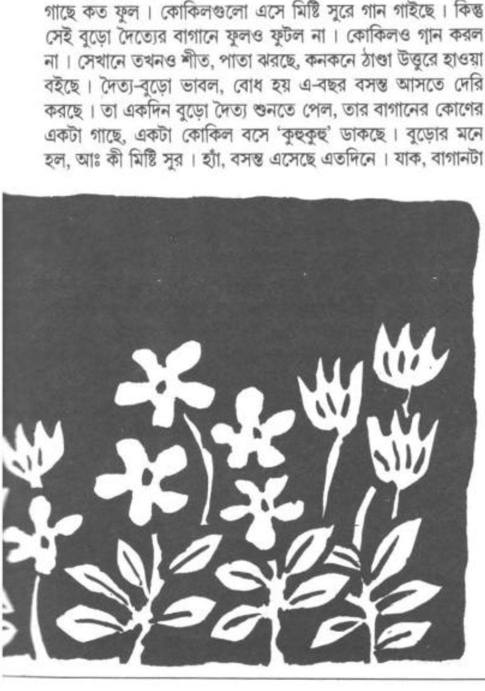

একটু ঘুরে আসি, বলে বুড়ো এল।

"আর এসে যা দেখল, তাতে চোখ তো ছানাবড়া। হয়েছে কী, পাঁচিলে একটা বড় গর্ত করে সেই দুষ্টু ছেলেগুলো কখন বাগানে ঢুকেছে সব। কেউ গাছে চড়েছে, কেউ ডালে বসে দেদার দুলছে। তখন সব গাছে ফুল, মেলা ফুল। শুধু একটা গাছ বাদে। ব্যাপার কী?

"বুড়ো কাছে গিয়ে দেখল, একটা খুব বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, অঝোরে কাঁদছে। সে এত ছোট যে, গাছে উঠতেই পারছে না। তাই দেখে গাছটা তার ডালগুলো নামিয়ে দিয়েছে, তবুও না। তখন বুড়োর মনে কী দয়া হল কে জানে? নিজেই ছেলেটাকে তুলে গাছের ডালে বসিয়ে দিল। আর দিতেই, গাছে ফুল ফুটল, পাখি গান গাইল। আর ছেলেটা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে কী আদর!"

মহাদেব মুগ্ধ হয়ে শুনতে-শুনতে বলে, "ঠিক তোর মতো। এত জোরে আমার গলা জড়িয়ে ধরিস যে...."

দিপু ধমক দেয়, "গল্পের মাঝখানে কথা বলো কেন? শুধু 'হুঁ' দিয়ে যাবে। আর কিচ্ছু না।"

মহাদেব হেসে বলে, "ও, আচ্ছা। বলে যা!"

দিপু বলে, "এই দেখে বুড়ো দৈত্য বলল, 'এই বাচ্চারা, এদিকে সব আয়। আজ থেকে এই বাগানেই তোরা সব খেলবি, গাছে উঠবি, ফলটল খাবি। আজ থেকে এ বাগান তোদের! বুঝলি?'"

দিপু শুয়ে পড়ে বালিশের দিকে আর-একটু উঠে যায়। মাথাটা নেমে গেছে। তারপর বলে, "দেখতে-দেখতে দৈত্যটা আরও বুড়ো হয়ে গেল। এখন সে একটা ইজিচেয়ারে বসে-বসে তার বাগানে বাচ্চাদের খেলা দ্যাখে শুধু। কিন্তু তার একটা দুঃখ, সেই বাচ্চাটা, যে দৈত্যের গলা জড়িয়ে ধরেছিল, আদর করেছিল, সে আর আসে না। বুড়ো কত খোঁজে। অন্য বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ রে, ও কোথায়? আসে না কেন?'

"বাচ্চাগুলো বলে, 'ওকে তো চিনি না, ও তো আমাদের দলের কেউ নয়?'

"'কেউ নয়? সে কী রে! ও তো তোদের সঙ্গে খেলতে এসেছিল সেদিন?'

"'না, বাপু, আমরা কেউ তাকে চিনি না।'

"বুড়োর মন খারাপ হয়ে যায়। সে ওই বাচ্চাটাকে যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে! কোথায় গেলে তাকে দেখতে পাবে?"

দিপু ঠেলা দেয়, "ও মহাদেবদা শুনছ?"

মহাদেবের খুব ভাল লাগছে। তার মনে হচ্ছে, এটা খুব দামি গল্প। আহা! তার তো আর সময় নেই। নইলে স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়ে এইরকম গল্প শুনত সেও। বলল, "তারপর?"

"তারপর একদিন বুড়ো তাকে দেখতে পেল। কিন্তু এ কী! তার দু' হাতের চেটোয়, দু' পায়ের পাতায় পেরেক মারার গর্ত, চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। তাই না দেখে বুড়ো গর্জন করে উঠল, 'বল, বল, কে তোকে এমন করে মেরেছে? নামটা বল। আমি তলোয়ার দিয়ে এক্ষুনি তার মাথাটা কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলব।'

"ছেলেটি বলে, 'শোনো, এই যে আমার হাতে পেরেক পোঁতার দাগ, এই যে রক্ত ঝরছে, এই যে ক্ষত, এ যে ভালবাসার চিহ্ন। আমি মানুষকে ভালবাসি। এগুলো তারই দাগ।'

"স্বার্থপর, বুড়ো দৈত্যটা অবাক! তার মনে হল, এই শিশু কে? ইনি কি প্রভু যিশু!

"হঠাৎ কী ভেবে দৈত্যটা দু' হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তার সামনে চুপ করে। তখন ছেলেটি খুশি হয়ে বলে, 'তোমার

বাগানে একদিন আমাকে খেলতে দিয়েছিলে। এবার এসো, আমার বাগানে তুমি খেলবে।'"'

মহাদেবের চোখে জল এসে যায়।

দিপু বলে, "জানো মহাদেবদা, সেদিন বিকেলে দুষ্টু ছেলেগুলো বাগানে খেলতে এসে কী দেখল ?"

দিপু থেমে যায়।

অবাক হয়ে মহাদেব বলে, "কী দেখল রে ?"

"দেখল, সেই রাগী দৈত্য বাগানে পড়ে আছে। বেচারা মরে গেছে কখন !"

মহাদেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। বাইরের দিকে তাকায়। তার মনে হয়, এই গল্পের মধ্যে আরও একটা গল্প লুকিয়ে আছে। কিন্তু সেই লুকিয়ে-থাকা গল্পটা কী !

না, মহাদেব সে গল্পটা ঠিক ধরতে পারে না। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারে, এটা সে-ই মহাপ্রভুর, ঝাড়গ্রামের পথ ধরে কাশী যাওয়ার ঘটনার মতো। একদিন মহাদেবও ওই পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে পুরীর দিকে যাচ্ছিল। পথে সেই যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। সেই সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'মহাদেব তোমার সময় হয়নি বাছা !'

মহাদেব সেদিন তার কথা বুঝতে পারেনি। বলেছিল, 'কিসের সময় ঠাকুর ?'

সন্ন্যাসী হেসে বলেছিলেন, 'ইস্কুল ছুটির।'

এই ইস্কুল ছুটি কথাটার মধ্যে যে রহস্য, এই গল্পের মধ্যেও প্রায় সেই রহস্য।

কখনও-কখনও মহাদেবের মনে হয়, আসল রহস্য হল, জীবনরহস্য। এই রহস্য যার ভেঙেছে, বা যে ভেঙে দিয়েছে, সে-ই ইস্কুলের ছুটির ঢং ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়েছে। তার তখন কী আনন্দ ! আকাশ ভরে যায় তার আনন্দে !

দিপু চুপ করে শুয়ে থাকে।

মহাদেব বলে, "কী রে ? ঘুম পাচ্ছে ?"

"একটু-একটু।"

"তবে চল। আয়, আমার কোলে আয়।"

মহাদেব জানে, ওকে একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নইলে ঘুমের ভাবটা কাটবে না। সারারাত না খেয়ে থাকবে। ওকে ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়ানো যায় না।

দিপুকে মহাদেব কাঁধে তুলে নেয়। জ্যোৎস্না উঠেছে একটু। উঠোনের ধান-গাদিগুলোর ধার দিয়ে সে এগোতে থাকে।

একটু যেতেই কাজের মেয়েটার সঙ্গে দেখা ! সে দিপুকে আনতে যাচ্ছিল। বলল, "মা-ঠাকরুনের শরীরটা ভাল না।" মহাদেব ভয় পেয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু যে বড়িগুলো দিয়েছিলেন ? বলেছিলেন বুকের কষ্ট হলে খেতে ?"

"খাইছন্তি। কিছি হয়নি।"

মহাদেব দেখতে যায় মা-ঠাকরুনকে। কথা বলতে পারছেন না। চোখগুলো কেমন কেমন। একটু সময় কাছে বসে থেকে সে চলে আসে মাথা নিচু করে।

উঠোন পেরিয়ে ধীরে-ধীরে নিজের ঘরে এসে চুপ করে বসে রইল মহাদেব।

একটু পরে নজরে পড়ল, দিপু তার পদ্য-লেখা বালির কাগজের খাতায় যে গানটা পেনসিল দিয়ে কাল লিখেছিল, সেই পাতাটা খোলা। আজ কখন এটা দেখে-দেখে গেয়েছিল বোধ হয়।

মহাদেব বারবার গানটা পড়ে। আহা ! কী কথা ! 'যত দিতে চাও কাজ দিও যদি তোমারে না দাও ভুলিতে/অন্তর যদি জড়াতে না দাও

জালজঞ্জালগুলিতে'। চমৎকার, ঠাকুর চমৎকার ! যত খুশি কাজ দাও, মাঠ থেকে ধান তোলা, ধান ঝাড়ানো, আলুর খেতে জল দেওয়া—চাষিদের নেকনজর। কিন্তু ঠাকুর, তোমাকে ভুলতে দিও না। সব কিছু কাজের ভিড়ের মধ্যে তোমাকে যেন ভুলে না যাই। তোমাকে ভুলে গেলে ষোলো আনাই মাটি ! ঠাকুর, ইস্কুলের ছুটি তার হবেনি।

আর কী ? না, সংসারের জঞ্জালের মধ্যে অন্তরকে যেন জড়িয়ে না ফেলি। কাজ করছিস, করবি। কিন্তু অন্তরকে ওই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলিস না ! অন্তরকে দূরে রাখবি !

কিন্তু ঠাকুর, তুমি তো বলেই খালাস। মানুষ কত পারে। এই যে দিপু। ও যখন গলা জড়িয়ে ধরে, গল্প করে, তখন অন্তর যে জুড়িয়ে যায়। অন্তরকে কী আলাদা করে রাখা যায় !

সে নিজেই নিজেকে বলে, 'মহাদেব, তুই ব্যাটা ভূমানন্দ। কিন্তু এতদিন সব কিছু উলটো কাজ করেছিস। ঘর ছেড়ে তো বেরিয়ে এসেছিলি। পথে-পথে বেশ চলছিলি—মহাপ্রভু একদিন যে পথ দিয়ে কাশী গিয়েছিলেন, সেই 'ঝাড়িখণ্ড' পথে তো বেশ এগোচ্ছিলি তুই। তারপর এসে জুটলি নরহরি মহাপাত্রের জমিদারিতে। চল্লিশটা বছর জালজঞ্জালের মধ্যে কাটিয়ে দিলি। এখন ? এখন ইস্কুলের ঘণ্টা শুনবি বলে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে কী লাভ ! তারপর আরও বলেছ, যত দিতে চাও কাজ দিও মোরে তোমারে না দাও ভুলিতে—কিন্তু ঠাকুর, আমি সব ভুলে বসে আছি। তোমাকে মনে করিনি, মনে রাখিনি। সব গোলমাল হয়ে গেছে যে !'

'তা হলে সংশোধন কর।'

'কী করে করব ঠাকুর ?'

'নিজেই বুঝতে পারবি। তোর ভেতরে যে জেগে আছে, সে-ই বলে দেবে। কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোকে। তুই সব কিছু ছেড়ে দে তাঁর ওপর। ব্যাটা, সন্ধেবেলায় ঠিক পৌঁছে যাবি। দেখবি সামনে সমুদ্র। বেলা পড়ে আসার সময়কার আকাশ দেখেছিস তো? তেমনই একটা ছায়া-ছায়া শান্তির সমুদ্র দেখতে পাবি।'

মহাদেব অন্ধকারের দিকে চেয়ে কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। কী ভাবছে সে! মা-ঠাকরুনকে দেখার পর মনটা এমন হল কেন?

এক সময় শুনতে পেল, উঠোন দিয়ে কে যেন দৌড়ে আসছে। শব্দটা ক্রমশ স্পষ্ট, যেন কাছে এসে পড়েছে।

॥ ৯ ॥

কাজের মেয়ে দৌড়ে আসছিল। এসে যা বলল, তাতে বোঝা গেল, মা-ঠাকরুন কেমন করছেন। বোধ হয় শেষমুহূর্ত এসে গেছে।

মহাদেব দৌড়ে যায়। তার অনুমান সত্য। আগে চোখ দেখেই বুঝেছিল। তবে এত শিগগির যে সে মুহূর্ত আসবে তা ভাবেনি। তা একরকম ভাল। মৃত্যু-যন্ত্রণা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হবে না।

হ্যাঁ, ঠিক। মা-ঠাকরুন চলে যাচ্ছেন।

একবার ডান হাতটা তুলে কিছু যেন বলতে চাইলেন। বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া শরীর স্থির।

কিন্তু কী বলতে চাইছেন?

কাজের মেয়েটিই শুধু বুঝতে পারল। সে মা-ঠাকরুনকে খুব ভালবাসত। সে মহাদেবকে বলল, "তুমে মুহে জল দিয় গো মহাদেবদা। মা চাহিছন্তি।"

মহাদেব অবাক হয়ে যায়। সে যে অন্য জাতের! জল দেওয়া কি উচিত হবে?

মেয়েটি হাঁউমাউ করে কেঁদে মহাদেবকে আবার বলে, "চলি যাইছন্তি, মা চলি যাইছন্তি। জল দিয়, জল দিয় গো।"

মহাদেব আর কিছু না ভেবে এক চামচ গঙ্গাজল মা-ঠাকরুনের মুখে দেয়। আশ্চর্য! এইজন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। জল দেওয়ার একটু পরে, মাথাটা বলিশের একদিকে গড়িয়ে পড়ে!

সব শেষ! মহাদেব বৈরাগীর এখানকার চল্লিশ বছরের পালাগান তবে ফুরোল! এবার আসর ভাঙার পালা।

বাবুকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। আসতে একটু রাত্রি হয়ে যাবে হয়তো। দিপু মহাদেবের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

বউমা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে। হাউহাউ করে কাঁদছেন।

এই কান্না শুনে দিপুও কাঁদছিল।

মহাদেব দিপুকে জোর করে বউমার কাছে দিয়ে চলে এল। এখন অনেক কাজ। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব একটা নেই। সে শুধু শবদাহের সৎকারের বাইরের ব্যবস্থাটুকু করতে লেগে যায়। লোকজনকে বলে, কোন গাছটা কাটা হবে। খোকাবাবু না আসা পর্যন্ত যতটা পারে, এসব কাজ সে এগিয়ে রাখবে। কীর্তনীয়াদের খবর দিতে হবে। গ্রামের লোকজন ডাকতে হবে। বামুন ঠাকুরকে সংবাদ দিতে হবে।

রাত্রিও নামছে। বাগান থেকে গাছ কাটার শব্দ আসছে এখন। সে শব্দের মধ্যে শুধু একটা মৃত্যুর সংবাদ। শব্দটা ছড়িয়ে পড়ছে লাল ধুলোর পথে, নদীর ধারে, ধান কেটে-নেওয়া খেতে। অন্ধকারের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে শব্দটা চলে যাচ্ছে অদূরের শালবনের দিকে।

মা-ঠাকরুন চলে গেলেন। কেউ আর তার জন্য দুধ পাঠিয়ে দেবেন না, বা খানিকটা ঘি। কেউ আর বলবে না,'মহাদেব তোর সেই কেত্তনটা গা তো, যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল।'

মা-গো ব্রজধামে মানুষের চিরকালের চোখের জল মিশে আছে! কত কাল, কত যুগ— !

ঘণ্টি বাজিয়ে কে যেন একটা সাইকেল দাঁড় করাল। মহাদেব দেখল, ডাকঘরের পিয়ন। এখানে সন্ধের দিকেই ডাক আসে।

পিয়ন বলল, "দাদু, এই তোমার চিঠি। আর-একটা পত্রিকা। রেজেস্ট্রি। সই করে দাও।"

চলে গেল পিয়ন।

মহাদেব চিঠিটা খুলল। আনন্দপুর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই লিখেছেন, 'আপনি যে ছেলেটির পড়ার খরচ দিয়ে আসছিলেন সে দশম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। আপনি আমাদের কোনও অনুষ্ঠানে আসেননি। এবার কিন্তু না এলে চলবে না। আপনি এই স্কুলকে ভালবাসেন। আপনাকে আমরা একটু সংবর্ধনা জানাতে চাই। তা ছাড়া এখানকার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আপনাকে 'কবিশেখর' উপাধি দিতে চায়। এটি একটি বিখ্যাত প্রাচীন টোল। আপনি প্রকৃতই একজন কবি। এঁরা আপনার সঙ্গে খুব শিগগির দেখা করবেন।'

চিঠিটা মুড়ে সেই খামে ঢুকিয়ে মহাদেব চুপ করে বসে থাকে। ইচ্ছে হয়, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কোনও প্রয়োজন নেই। ইস্কুলে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেলে আবার 'কেলাস' কেন ঠাকুর! সে কেলাসে কি মন বসে?

রাত্রি বাড়ছে। শীত আরও তীব্র। গাছ কাটার শব্দ মিলিয়ে

আসছে ক্রমশ। পণ্ডিত পীতাম্বর সনবিগ্রাহীর গলা ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে। কী-কী করতে হবে সব বলছেন লোকজনকে।

একটা সাইকেল রিকশ এসে দাঁড়াল। খোকাবাবু দ্রুত উঠোন পেরিয়ে ভেতর বাড়িতে চলে গেলেন।

আস্তে-আস্তে উঠে হ্যারিকেনটা জ্বালাল মহাদেব। দেখল কবিতাটা পত্রিকায় বেরিয়েছে। কিন্তু সে পড়ল না। আবার রেখে দিল, যেখানে অন্যগুলো রাখা আছে। তারপর আলোর দম কমিয়ে বাইরের বেঞ্চে এসে চুপ করে বসল। সামনে তার নিজের হাতে তৈরি বাগানটা চেয়ে আছে তার দিকে। গন্ধরাজ, শিউলি, কামিনী, বেল, রক্তকরবী, টগর, হেনা ফুলের গাছ। নিমগাছটা রাস্তার দিকে। পাতা ঝরে গেছে তার। আবার নতুন পাতা হবে, ফুল হবে। কিন্তু মহাদেব বৈরাগী, সে কি দেখতে পাবে তা।

অনেকক্ষণ পরে মহাদেব দেখল শবদেহ নিয়ে নদীতীরের শ্মশানের দিকে ওরা চলে যাচ্ছে। হ্যাজাক জ্বলছে, সেটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন। সে আলোয় পথের ও মাঠের অন্ধকারগুলো সরে যাচ্ছে। সরে গেলে তারপর সে অন্ধকার আরও ঘন হয়, শিশির পড়ে, ভারী হয়।

মহাদেব চুপ করে বসে থাকে। সৎকারের ব্যবস্থা তার কথামতোই সব হয়েছে। এখন খোকাবাবু এসে গেছে। তার আর কোনও কাজ নেই।

কিন্তু কেন এমন সব কিছু ফাঁকা-ফাঁকা লাগে! কর্তাবাবুর মৃত্যুও তো দেখেছে মহাদেব। সেদিন বড় কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এই ফাঁকা-ফাঁকা ভাবটা একটু অন্যরকম। এ যেন শেষ নয়, শুরু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটা অধ্যায় শেষ করে আবার একটা অধ্যায় আরম্ভ করার মাঝখান এটা। ফাঁকা-ফাঁকা সেইজন্যই লাগছে বোধ হয়।

মহাদেব আজ আর কিছু খাবে না। রাত হচ্ছে। দিপুও আজ আসবে না। হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর মহাদেব বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না।

সে-ই কবে মহাদেব নিজের গ্রাম চৈতন্যপুর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল। শেষ রাতে ইস্কুলঘরের দাওয়ায় বসে ছিল একটু। তার শৈশবের নামতা মুখস্থ করা কণ্ঠস্বর শুনেছিল। মাটির মধ্যে, ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সেই ছেলেবেলার সুরগুলি। দুনিয়ায় কোনও কিছু হারায় না ঠাকুর। সব জমা হয়ে থাকে কোনও তোরঙ্গের মধ্যে। একটু পরেই গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিল সে। আর কখনও ফিরে যায়নি।

ফিরে যাবে না আর। একবার ছেড়ে এলে আর ফেরা যায় না। শুধু সেই বেদনাগুলির কথা মাঝে-মাঝে মনে হয়। অন্য কিছু নয়। তবে তার ওপর একটা আবরণ পড়ে যায়।

আচ্ছা, মহাদেব আগেকার ঘর ছাড়ার কথা ভাবছে কেন? তার সঙ্গে এখনকার কী মিল আছে? সে তখন ছিল যুবক। এখন বৃদ্ধ। সেই গেরুয়া রঙের উত্তরীয়টা কবে ছিঁড়ে গেছে। সে ঝোলাটাও।

মহাপাত্রদের জমিদারিতে চল্লিশ বছর থাকার পর সেই পুরনো

আকাশে ওড়ার কথা □ চৌত্রিশ

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ : ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান কম্পানি কে·এল·এম·

ইউরোপে বিমানসংস্থাগুলি দ্রুত উন্নতি করতে থাকে, তার কারণ সেখানে নতুন-নতুন যাত্রিবাহী বিমান তৈরি হতে লাগল। ইংল্যান্ডের ছোট সংস্থাগুলি মিলে হল ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের পূর্বসুরি)। ইউরোপের বিমান নির্মাতাদের মধ্যে ডি·হ্যাভিল্যান্ড, ফারমান ও অ্যান্টন ফকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে বিমান নির্মাণে বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকায় ফকার হল্যান্ডে কারখানা করলেন ও কয়েকটি চমৎকার বিমান, যেমন ফকার এফ-৩-এর পর ১৯২৪-এ তৈরি করলেন এফ-৭, যা বিশ্বের বহু বিমানসংস্থা ব্যবহার করেছে। হল্যান্ডের জাতীয় বিমানসংস্থা কে·এল·এম· এফ-৭ বিমানের সাহায্যে হল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডাম থেকে ওলন্দাজ-পূর্ব এশিয়ার (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া) বাটাভিয়া অবধি নিয়মিত বিমান চলাচলের উদ্দেশ্যে এক পরীক্ষামূলক ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেন। এতে ডাক বহন করা হয়েছিল। বিমানটি বাটাভিয়ার পথে কলকাতায় নামে ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায়। কলকাতায় কোনও বিমান আসার কথা থাকলে দমদমে বহু লোক জমা হয়ে যেতেন মজা দেখতে। ওলন্দাজ বৈমানিক ভ্যানডার হুপ ও এইচ পোলম্যানের দমদমে নামার কথা ছিল বেলা দুটোয়। কিন্তু পথ ভুল করায় তাঁদের দেরি হয়ে যায়। বৈমানিকদের পথ চেনাবার জন্য শ্যামবাজার থেকে দমদম অবধি পথের দু'ধারে মশাল জ্বেলে রাখা হয়েছিল। পরদিন বিমানটি বাটাভিয়ার পথে আকিয়াবের দিকে উড়ে যায়।

ফকার এফ-৭ বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : অ্যান্টন ফকার, হল্যান্ড।
ডানার আয়তন : ২২·০৮ মিঃ।
লম্বায় : ১৪·৫০ মিঃ।
যাত্রী বা বৈমানিক : ২ জন বৈমানিক ও ৮ জন যাত্রী।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার।
এঞ্জিন : একটি ৩৬০ অশ্বশক্তির রোলস রয়েস ঈগল।

মহাদেবের কিছুই তো আর নেই ! খোল-নলচে বদলে গেছে না ?

কিন্তু এমন কিছু আছে যা ছেঁড়ে না, বদল হয় না, রং উঠে ঝাপসা বা বিবর্ণ হয়ে যায় না। সাধু-সন্ন্যাসীরা তাকেই খোঁজেন।

মহাদেব চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকে।

রাত্রি গভীর হয়। বাগান থেকে ঝিঁঝির শব্দ আসে।

এতক্ষণে শ্মশানযাত্রীরা ফিরছে। তাদের মৃদু কথা বলার শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রাত তখনও শেষ হয়নি। মহাদেব ঘুমোয়নি একটুও। সারারাত সে ভাবছে। এক সময় কাঁথাটা গা থেকে সরিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে পড়ল। বসে রইল একটু সময়। তারপর কী মনে করে জামাটা পরল, চাদরটা বেশ করে গায়ে জড়াল কান ঢাকা দিয়ে। একটু বেমানান লাগছে। কর্তাবাবুর দেওয়া দামি শাল। তা হোক। নতুন পত্রিকাটার ভেতরে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে রাখে। নীলমণি জানার ইংরেজি বই কেনার জন্য। তারপর ঝুলিটা কাঁধে ফেলে লাঠিটা হাতে নেয়।

আবার ঝাড়িখণ্ড পথ, আবার পথচলা। পুরীর কাছে কোথায় সেই 'নিত্যানন্দ আশ্রম' ? কতদূর ঠাকুর ! এ-জীবনে পৌঁছতে পারব তো ?

সামনেই লাল মোরামের রাস্তা। রাত্রির শিশির পড়ে-পড়ে পিছল হয়েছে একটু। নিমগাছের পাতা-ঝরা ডালগুলো আকাশের তারার দিকে যেন হাত বাড়িয়ে শেষ রাতে কিছু ভিক্ষে চাইছে। চারদিকটা শান্ত। কোথাও কেউ নেই।

মহাদেব ধীরে-ধীরে পথে নামে।

সে জানে সকাল হলেই দিপু আসবে এবং নতুন দেখে পত্রিকাটাই আগে খুলবে। ভাববে, মহাদেবদা একটু এদিক-ওদিক কোথাও গেছে। আসবে একটু পরে। কিন্তু সে তখন কোথায় ?

সকালবেলাই দিপু খুঁজছিল মহাদেবদাকে। ঠাকুমার চলে যাওয়ার পর, কাল থেকে সে কতক্ষণ তাকে দ্যাখেনি। ছিটেবেড়ার ঘরটা খোলাই ছিল। পাল্লা দুটো তেমনই ভেজানো শুধু। তেমনই করে ডাকতে-ডাকতে আসছিল, "ও মহাদেবদা ? তুমি কোথায় ?"

কিন্তু আজ কেউ সাড়া দেয়নি, "দিপু, আমি এখানে রে। আস্তে-আস্তে আয়, দৌড়চ্ছিস কেন ?"

সাড়া না পেয়ে দিপু একটু অবাক হয়। ভয়ে, ঘরে ঢোকে। আরে, নতুন পত্রিকাটা এসেছে। তাড়াতাড়ি খুলে দ্যাখে, মহাদেবদার নামটা আছে কি না ! আরে, আছে তো। কবিতাটার নাম 'বিদায়'।

ভোরবেলাকার পথ ধরে তুই চললি কোথায় দূরে
ঘরছাড়া তোর মনটা কেন একা,
সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে গাছতলাতে রাতে
পেতেও পারিস দোসর জনের দেখা।
অচেনাকে চিনবি বলে সেই যে এসেছিলি
চেনার মধ্যে খুঁজতে গেলি তাঁকে,
পাবি কোথায় ? ওরে অবুঝ বিশ্ব-পথের ধূলি
তাঁরি করুণ পায়ের চিহ্ন আঁকে।
এবারে আর ফিরিস না রে, ছুটির ঘণ্টা বাজে,
কোনো নদী কোনো বনের ধারে
বৈরাগী তুই সেইখানেতে নামিয়ে দে তোর ঝুলি
শেষের দিনের প্রণাম রেখে যা-রে।

কবিতা পড়া শেষ করে দিপু চুপ হয়ে যায়। মনটা কেন যেন খারাপ লাগে। সে চিৎকার করে আবার ডাকে, "মহাদেবদা, ও মহাদেবদা, তুমি কোথায় ?"

শব্দটা দূরে-দূরে ছড়িয়ে যায়। তারপর সকালের রোদের মধ্যে হারিয়ে যায় এক সময়। হঠাৎ তার নজর পড়ে, আরে, মহাদেবদার ঝুলিটা তো নেই। লাঠিটাও, বিছানাটা এমন গোল করে গোছানো যে, আর কখনও পাতা হবে না !

দিপু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে হয় মহাদেবদার চলে যাওয়াও ঠাকুমার চলে যাওয়ার মতো। আর ফিরে না-আসা।

হঠাৎ বড় কান্না পায় তার !

শূন্য ছিটেবেড়ার ঘরটা লাল মোরামের রাস্তার ধারে চুপ করে চেয়ে থাকে। সামনের ছোট্ট সেই বাগানে রোদ এসে পড়েছে। সে রোদ এখনও একটু যেন ভেজা-ভেজা। শিউলিগাছটার তলায় কয়েকটা ফুল মাটিতে ঝরে পড়ে থাকে শুধু।

(সমাপ্ত)

ছবি : দেবাশিস দেব

বাউন্টি জাহাজে বিদ্রোহ

খোলা এক নৌকোয় করে বিদ্রোহী নাবিকরা ব্লাইকে নামিয়ে দিয়েছিলেন সমুদ্রের বুকে । কেন এই বিদ্রোহ ?

জাহাজটি সর্বসাকুল্যে প্রায় ২১৫ টন ভারী, ডেকের দৈর্ঘ্য ৯০ ফুট ১০ ইঞ্চি । ব্যালাস্ট-রেখা বরাবর কাঠের তক্তাগুলি ধরলে জাহাজটা প্রায় ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া । মাস্তুলের গায়ে অশ্বারোহী এক মহিলার মূর্তি আঁকা । — 'বাউন্টি' জাহাজের লেফটেন্যান্ট-ইন-কম্যান্ড উইলিয়াম ব্লাই এভাবেই তাঁর জাহাজের বর্ণনা শুরু করেছিলেন ।
১৭৮৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ সমুদ্রের স্পিটহেড বন্দর থেকে বাউন্টি শুরু করেছিল তার যাত্রা । দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে সে এখন ভাসবে সমুদ্রের জোয়ারে । জাহাজের ডেকে তখন সবসুদ্ধ ৪৬ জন, এঁরা সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এই জাহাজে যোগ দিয়েছেন । জাহাজ কোথায়, কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, তখনও এই ৪৬ জন মানুষকে তা জানানো হয়নি । তেনেরিফ ছাড়ার পর ব্লাই এই ৪৬ জন নাবিককে ডেকের ওপর একত্রিত করলেন, তিনটি দলে এঁদের ভাগ করা হল । জাহাজেই ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ানের পদোন্নতি হল, তাঁর অধীনে রইল একটি দল । এ ছাড়াও জাহাজে রয়েছে দু'জন উদ্যান-বিশারদ, ৬২৯টি ফুলগাছের টব । এতক্ষণে সবাই আন্দাজ করতে পারলেন, বাউন্টি জাহাজ সমুদ্রে নেমেছে বিশেষ কোনও অভিযানের কাজে । এটা নিছক কোনও সমুদ্রযাত্রা নয় । ব্লাই চার বছর ক্যাপ্টেন কুকের অধীনে চাকরি করেছিলেন, এবার তাঁর লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগরের সোসাইটি দ্বীপ থেকে ব্রেড-ফ্রুটের চারা সংগ্রহ করে সেগুলি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও স্থাপন করা । ব্রেড-ফ্রুট খুব সহজেই সেখানে খাদ্যদ্রব্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে ।
১৭৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর বাউন্টি নোঙর ফেলল তাহিতি দ্বীপে । দ্বীপের অধিবাসীরা সহাস্য অভিনন্দন জানাল এই জাহাজের নাবিকদের, জানতে চাইল ক্যাপ্টেন কুকের খবরাখবর । তেইশ সপ্তাহ ধরে জাহাজ রইল তাহিতি দ্বীপে, সংগৃহীত হল ১০১৫টি ব্রেড-ফ্রুটের চারা । ৩ মার্চ ব্লাই আবার জাহাজ ভাসালেন তাহিতি থেকে ।
২৮ এপ্রিল ভোরে ক্রিশ্চিয়ান আচমকা জাহাজের ভার নিলেন নিজের হাতে, ব্লাই ও আরও ১৮ জন নাবিককে খোলা এক নৌকোয় করে নামিয়ে দিলেন সমুদ্রের বুকে । ব্লাই এবারও নাবিক হিসেবে অসাধারণ দক্ষতা দেখালেন । ওই খোলা নৌকোয় করে ৩৬১৮ মাইল পাড়ি দিয়ে পৌঁছলেন টিমর দ্বীপের ডাচ উপনিবেশে । সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে ফিরলেন ইংল্যান্ডে । বিদ্রোহী নাবিকরা বাউন্টিকে নিয়ে ফিরে গেল তাহিতি দ্বীপে, সেখানে তারা আবার নিজেদের মধ্যে দু' দলে ভাগ হয়ে গেল । ১৬ জন নেমে গেল জাহাজ থেকে । ক্রিশ্চিয়ান ও বাকি ৮ জন ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে এবার তাহিতি থেকে ২৭ জন দেশীয় বাসিন্দাকে উঠিয়ে নিল তাদের জাহাজে ।
বিদ্রোহী নাবিকদের অধীনে আবার যাত্রা শুরু করল বাউন্টি । কেউ জানে না কোথায় । দু' বছর পর প্যান্ডোরা নামের এক যুদ্ধজাহাজ তাহিতি থেকে বিদ্রোহীদের উদ্ধার করল । ১০ জনের হল কোর্ট-মার্শাল, ৩ জনের ফাঁসি ।
বাউন্টি জাহাজের এই বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি । ব্লাই কোনও অত্যাচারী দলনেতা ছিলেন না, অফিসার হিসেবে বরং তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত । আর-একটা ব্যাপারেও কোনও প্রশ্ন নেই । বিদ্রোহটা কোনও পরিকল্পনা ছাড়া হঠাৎ ঘটেছিল, ব্লাই ও জাহাজের বেশির ভাগ অফিসারই এই ঘটনায় রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন । বিদ্রোহের নেতা ক্রিশ্চিয়ান ছিলেন ব্লাইয়ের অন্যতম প্রিয়পাত্র ।
বাউন্টি জাহাজের ভাগ্য জানা গিয়েছিল আরও ২০ বছর পরে । ১৮০৮ সালে তাহিতি থেকে ১২০০ মাইল দূরে জনমানবহীন পিটকেয়ার্ন দ্বীপে তিমি-শিকারি এক মার্কিন জাহাজ আবিষ্কার করেছিল বাউন্টি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ । জন অ্যাডামস নামে এক বৃদ্ধ সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বাস করছেন । এই জন অ্যাডামস-ই ক্রিশ্চিয়ানের দলের শেষ জীবিত সদস্য, তাঁর আসল নাম আলেকজান্ডার স্মিথ ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপে ব্রেড-ফ্রুট নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ব্লাই যে সফল আর-একটি অভিযান চালিয়েছিলেন, সে-কথাও আজ অনেকে ভুলে গেছেন ।
বাউন্টি জাহাজের এই বিদ্রোহ পরবর্তীকালে চিত্র-পরিচালকদেরও নজর কেড়েছে । এই বিদ্রোহ নিয়ে তোলা হয়েছিল চারটি চলচ্চিত্র । তার একটিতে ক্রিশ্চিয়ানের ভূমিকায় ছিলেন ক্লার্ক গেব্‌ল, ব্লাইয়ের ভূমিকায় চার্লস ল্যাংগথন । বিদ্রোহীদের নেতার ভূমিকায় ছিলেন মার্লন ব্র্যান্ডো ।

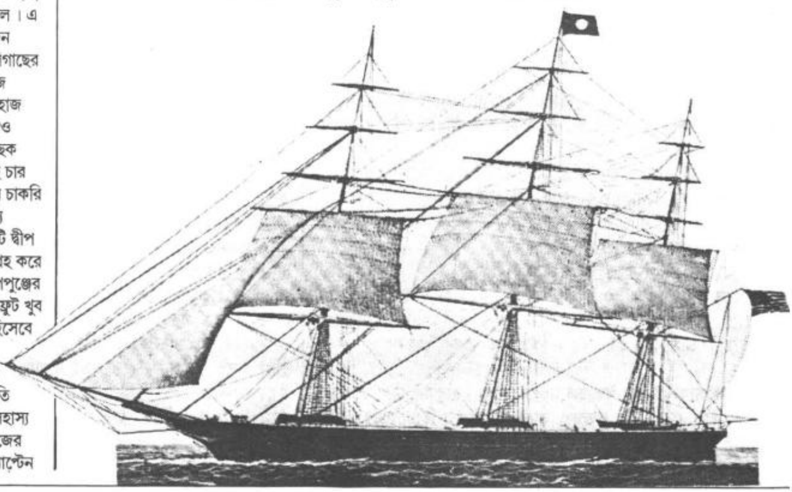

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১)'কক্স' শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ? **অনিকেত বসু,** কলকাতা-১৪।
(২)'ই· সি· এম' কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ কী ? **সঞ্জয় পাল,** কলকাতা-৪৬।
(৩) কোন নদীকে 'বাংলার দুঃখ' বলা হয় ? **রিনা দে,** চেতলা।
(৪) ভারতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সংবাদপত্র কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় ? **মিতা দে,** চেতলা।
(৫) 'গুড বাই' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ কী ? **নীলাদ্রিশেখর সামন্ত,** মেদিনীপুর।
(৬) সম্রাট কণিষ্ক কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন ? **শম্ভুনাথ পাল ও প্রসেনজিৎ কোলে,** বর্ধমান।
(৭) 'তেনালিরামা' টিভি সিরিয়ালে তেনালিরামের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছিলেন ? **শুভস্মিত গোস্বামী,** জলপাইগুড়ি
(৮) চিনের সরকারি সংবাদ-সংস্থার নাম কী ? **ডোডো দাশগুপ্ত,** কলকাতা-১৪।
(৯) ভেনেজুয়েলার রাজধানীর নাম কী ? **শঙ্কর পাল,** বৈদ্যবাটী।
(১০) 'ডেথ ভ্যালি' কোথায় অবস্থিত ? **অজয় শর্মা,** কোন্নগর।
(১১) প্রথম রথম্যান্স কাপে 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' কে হয়েছিলেন ? **সুজয়, শৈবাল ও সৌম্যেন্দ্র,** ভোগপুর।
(১২) কত ফার্লং-এ এক মাইল ? **তাপস কোনার,** বর্ধমান।
(১৩) ১৮৭০ সালের ১০ এপ্রিল রাশিয়ায় কোন মহান নেতা জন্মেছিলেন ? **বন্দিতা ঘোষ,** মালদহ।
(১৪) কোন ভারতীয় মহিলা সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন ? **উত্তম মোদক,** বর্ধমান।
(১৫) মহাভারত টি· ভি· সিরিয়ালের সময় 'ম্যায় সময় হুঁ' এই নেপথ্যভাষ্যটি কে বলতেন ? **সৌম্যেশ মণ্ডল,** ভোগপুর।
(১৬) গত বছর মেয়েদের বিভাগে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছিলেন ? **সুজাতা মুখার্জি,** রানিগঞ্জ।
(১৭) ১৯৯০-এর ফরাসি ওপেন টেনিস (মহিলা) চ্যাম্পিয়ান কে ? **অনিককুমার সাঁই,** বর্ধমান।
(১৮) 'গেস্টাপো' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ কী ? **দেবলীনা রায়,** টালিগঞ্জ।
(১৯) ওস্কোলজি বিষয়ে কী নিয়ে চর্চা করা হয় ? **অচিন্ত্য ঘোষ,** বোলপুর।
(২০) 'ইয়াদ ভাশেম' স্মৃতিস্তম্ভ কোথায় ? **আনন্দ বসু,** গড়িয়া।
(২১) কে বলেছিলেন, "স্বাধীনতা! দেখে যাও, তোমার নামে আজ কী অত্যাচার চলছে ?" **বিমল সান্যাল,** সিউড়ি।
(২২) গ্যাসোলিন-চালিত প্রথম গাড়ি কোনটি ? কে তৈরি করেছিলেন ? **কল্যাণ বসু,** শান্তিপুর।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি।
(২) শাহবাজ খান।
(৩) ব্রিজ।
(৪) অটোয়া।
(৫) সিমি গারওয়াল ও ওয়াহিদা রেহমান।
(৬) মাইকেল ফ্যারাডে।
(৭) সার আইজাক নিউটন।
(৮) লি ফক।
(৯) উর্দু।
(১০) রমেশ কৃষ্ণান।
(১১) হামিং বার্ড।
(১২) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
(১৩) শালিমার।
(১৪) ক্যামেরুনের ফ্রাঙ্কোয়া ওমাম বিইক।
(১৫) কালিদাস রায়।
(১৬) নেলসন ম্যান্ডেলা।
(১৭) ম্যাক্সিম গোর্কি।
(১৮) মার্গারেট মিচেল।
(১৯) সফোক্লিস।
(২০) জুলিয়াস সিজার

রিচার্ড হ্যাডলি

সার আইজাক নিউটন

রমেশ কৃষ্ণান

নেলসন ম্যান্ডেলা

বিষয় : সমাধিসৌধ

প্রশ্ন

(১) 'স্বাধীন, অবশেষে আমি স্বাধীন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ। শেষ পর্যন্ত আমি আজ স্বাধীন।' কার সমাধিফলকে এই পঙ্‌ক্তিগুলি লেখা আছে ?

(২) 'কবিদের চত্বর' (পোয়েট্‌স কর্নার) কোথায় অবস্থিত ?

(৩) কলকাতার শহিদ মিনারে কোন তিনটি শব্দ লেখা আছে ?

(৪) কলকাতার এক সমাধিফলকে লেখা আছে, 'তিনি ছিলেন অক্লান্ত এক পথিক। পরদেশে বহুকাল বাস করার পর অবশেষে ফিরে গেছেন তাঁর সেই চিরন্তন, শাশ্বত দেশে।' কার সমাধি ?

(৫) ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে দাঁড়ানো অবস্থায় কাকে সমাহিত করা হয়েছিল ?

(৬) 'শান্তিতে ঘুমোও। আর কোনওদিন আমরা এই ভুল করব না।' কোন স্মৃতিস্তম্ভে এই লাইনগুলি লেখা আছে ?

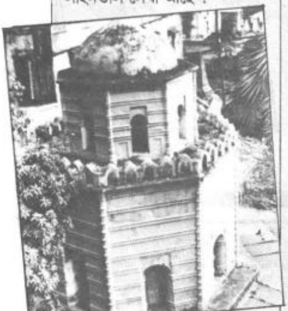

জোব চার্নকের সমাধি

(৭) কোন ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সমাধিতে লেখা আছে 'ইস্পাতের সময়ের শক্ত, সিধে ফলা' ?

(৮) ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে কোন ভারতীয়ের সমাধি আছে ?

(৯) নয়া দিল্লির যুদ্ধস্তম্ভের জনপ্রিয় নামটি কী ?

(১০) আমেরিকার কোন সমাধিস্থল সে-দেশের জাতীয় শহিদ-বেদির মর্যাদা পেয়েছে ?

(১১) পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভের নাম বোধ হয় তাজমহল। কোন স্থপতি এই তাজমহলের পরিকল্পনা করেছিলেন ?

(খ)

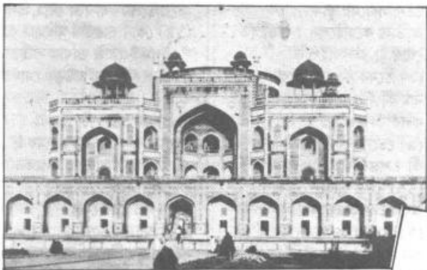

(গ)

প্রশ্ন

(ক) পিরামিড-আকৃতির এই স্তম্ভটি মিশরের প্রয়াত এক প্রেসিডেন্টের সমাধি। তাঁর নাম কী ?

(খ) এক মুঘল সম্রাটের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে এই সমাধিতে। কে সেই সম্রাট ?

(গ) সফদর জং-এর সমাধি। কোন শহরে এটি আছে ?

(ক)

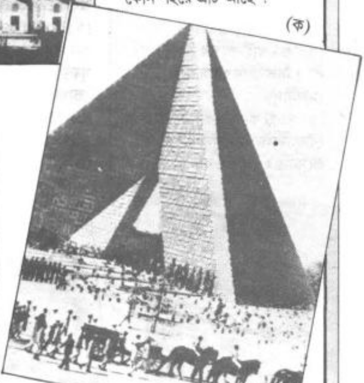

ছবির পরিচয় : (ক) আনওয়ার সাদাত। (খ) হুমায়ুন। (গ) দিল্লি।

(১২) 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এ পার্শিরা উন্মুক্ত অবস্থায় তাঁদের মৃতদেহ রেখে দেন। এই টাওয়ারের আর-একটি নাম কী ?

(১৩) প্যারিস শহরে কোন ফরাসি রাষ্ট্রনায়ককে বিকলাঙ্গদের মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ?

(১৪) আমেরিকার গৃহযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের উদ্দেশে একটি সমাধিস্থল উৎসর্গ করার সময় পৃথিবীবিখ্যাত একটি ভাষণ দেওয়া হয়েছিল। কী সেই ভাষণ ?

(১৫) কলকাতার সবচেয়ে পুরনো সমাধিস্থল কোনটি ?

(১৬) বিজাপুরের গোলগম্বুজ কার স্মৃতিতে গড়া হয়েছিল ?

(১৭) সমাধিস্তম্ভের ইংরেজি নাম 'মুসোলিয়াম'। এই শব্দের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল ?

(১৮) ভারতের কোথায় 'স্বাধীনতার শিখা' নামে ৪৩ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ আছে ?

(১৯) হাওয়ার্ড কার্টার ও লর্ড কারনারভন ধনরত্ন পরিপূর্ণ অবস্থায় কোন মিশরীয় সম্রাটের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন ?

(২০) 'দাঁড়াও, পথিক বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত—'
পার্ক সার্কাসের এক সমাধিস্থলে বিখ্যাত এই সমাধিলিপিটি আছে। কার সমাধি ?

উত্তর : (১) মার্টিন লুথার কিং। (২) লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে। এখানে কয়েকজন বিখ্যাত কবির সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। (৩) দ্য গ্লোরিয়াস ডেড (মহান শহিদের দল)। (৪) কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের সমাধি। (৫) নাট্যকার, কবি বেন জনসন। (৬) হিরোসিমা স্তম্ভে। ১৯৪৫ সালে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে এই স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল। (৭) সার আর্থার কোনান ডয়েল। (৮) রাজা রামমোহন রায়। (৯) ইন্ডিয়া গেট। (১০) আরলিংটন জাতীয় সমাধিস্থল। (১১) ওস্তাদ ইশা। (১২) দাখমা। (১৩) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। (১৪) আব্রাহাম লিঙ্কনের বিখ্যাত গ্যাটিসবার্গ ভাষণ। (১৫) কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের সেন্ট জনস সমাধিস্থল। (১৬) মহম্মদ আদিল শাহ। (১৭) প্রাচীনকালের পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম একটি আশ্চর্য হল হ্যালিকারনামাস নগরীর রাজা মুসোলাসের সমাধি। এই সমাধিকে বলা হত মুসোলিয়াম। (১৮) জালিয়ানওয়ালাবাগ। (১৯) তুতেনখামেন। (২০) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

দড়াম
গুড়ুম
গুড়ুম
ঝন্
আগুন ! আগুন !
আগুন ! আগুন !
সর্বনাশ ! সেই জ্বলন্ত কাঠটা ছুঁড়েছিলাম··· তার থেকে সারা ঘরে আগুন লেগেছে !
আগুন ? সত্যিই আগুন, নাকি আমাকে ধোঁকা দিয়ে বাইরে নেওয়ার ফন্দি ?
কী ব্যাপার ? বড় ক্লান্ত লাগছে···না, ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না···কিছুতেই না··· আমাকে অবশ্যই···

কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
কব নিঃস্ব হলে দামি ছবিগুলি শস্তায় বেচে দেবে, তাই ম্যাক্সওয়েল কবকে বেহুঁশ করার ওষুধ খাইয়েছে এবং রেসের সময় কব বেহুঁশ হয়ে গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যাটম্যান সতর্ক…
চলো, বেসি! কেমন ছুটতে পারো দেখিয়ে দাও!
কবের গাড়িতে ও কে?
পোশাক দেখে চিনতে পারছ না? ও ব্যাটম্যান! ছোটো, ব্যাটম্যান!
হেইও! রেস এবার জমবে!
উৎসাহিত বেসি টগবগিয়ে ছুটল…
শাবাশ, বেসি…তুমি ঠিক বাজি মারবে! কবের কথা মনে রেখে বাজি জিততেই হবে…চলো…
বেসি ক্রমেই ব্যবধান কমিয়ে আনছে…
এই তো চাই…ছুটে চলো, বেসি…জিততে হবে… জিততেই হবে!
বেসি মেরে দিয়েছে!
কবের গাড়ি প্রথম!
উঁহু…দুঃখিত, ব্যাটম্যান! আমি বিচারকদের কাছ থেকে আসছি! নিয়ম বলছে—দৌড়ের শুরুতে যে গাড়ি চালাবে তাকেই দৌড় শেষ করতে হবে!
দুঃখের কথা! আমি চেয়েছিলাম নিজের ঘোড়া জিতলে কব সান্ত্বনা পাবে!
আমাকে ছেড়ে দাও বলছি! উহ্‌!
নড়লে তোমার হাত ছিঁড়ে ফেলব, ছুঁচো কোথাকার!
দ্যাখো, অচেনা জায়গা খুঁজতে গিয়ে কী পেয়েছি!
এর মানে কী?
সার্কাসের এক খেলোয়াড়ের হত্যা, মিঃ ম্যাক্সওয়েল! ধোঁকা দিয়ে মিঃ কবের কাছ থেকে হোমার বেনসনের দামি ছবিগুলি হাতাবার ফন্দি যা দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিলেন!
পরে…
একটা ব্যাপার ছাড়া সব পরিষ্কার! ম্যাক্সওয়েল তো ছবিগুলি চুরি করলেই পারত!
চোরাই ছবি বিক্রি করলে সহজেই ধরা পড়ত! তাই আপনার কাছ থেকে বৈধভাবে কেনা প্রয়োজন ছিল…যদিও নামমাত্র মূল্য দিয়ে বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি!
ওগুলি বিক্রি করুন, মিঃ কব! পৃথিবীর লোককে হোমার বেনসনের মহৎ শিল্প দেখতে দিন!
বুঝেছি, ওগুলি আমার চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখা স্বার্থপরতা…তবে একটি ছবি বিক্রি করব না… রবিবারের পোশাকে আমার স্ত্রীর ছবি!—
সাত দিন বাদে…ব্রুস ওয়েন এবং ডিক গ্রেসন গোথামসিটিতে এক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন দেখতে এসেছে…
সারা…
রবিবারের পোশাকে!
সারা কব
বিক্রি হবে না

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গনপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

শুভঙ্কর আর তিন্নি এক গ্লাস করে জল খেয়ে হাঁফ ছাড়ল। তারপর মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়ে গরম চায়ে চুমুক দিল তৃপ্তি করে।

দোকানদার বলল,"তোমরা এদিকে কোথায় যাবে ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা যাব ঠাকরুনপাহাড়ি।"

"কাদের বাড়ি ?"

"কারও বাড়ি নয়। এমনই বেড়াতে।"

"বেড়াতে ! মাথা খারাপ নাকি ! এই বনে-জঙ্গলে কোথায় বেড়াবে ?"

"আমরা বন-জঙ্গল দেখতে এসেছি। তাই বনে-জঙ্গলেই বেড়াব। পাহাড়ে উঠব। ঠাকরুনপাহাড়ি এখান থেকে কতদূর ?"

"তা দূর আছে বইকী। এই দোকানের পাশ দিয়েই যে সরু রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের দিকে ঢুকে গেছে ওই পথেই ঠাকরুনপাহাড়ি। কিন্তু ওখানে কেউ শখ করে বেড়াতে যায় না। তাও এই অসময়ে।"

"আমরা যাব।"

"এসেছ যখন যাও। তবে কী আর আছে দেখার ? একটা পাথরের খনি ছিল, সেটাও কবে থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।"

শুভঙ্কর বলল, "এটাই কি তা হলে বদাডিহি গ্রাম ?"

"হ্যাঁ, এইটাই বদাডিহি। কী করে জানলে ?"

"বেলপাহাড়ির এক ভদ্রলোক আমাদের বলে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম বদাডিহি থেকেই ঠাকরুনপাহাড়ির রাস্তা।"

দোকানদার বলল, "যাই হোক, তোমরা যখন এসেইছ পাহাড়-জঙ্গল দেখবে বলে, তখন ওই চাতন পাহাড়টায় একবার উঠে এসো।"

শুভঙ্কর বলল, "ও পাহাড়ে উঠব কী করে ? যা জঙ্গল। পথ কই ?"

"আসলে তোমরা বর্ষার পর এসেছ তো। চারদিকে আগাছার বন গজিয়ে গেছে। তা চলো, এখন এই এত বেলায় খদ্দেরপত্তর তো নেই। বাসও বন্ধ। আমিই তোমাদের সঙ্গে করে পাহাড়ে উঠিয়ে আনছি।" বলে ওদের কাছ থেকে দাম নিয়ে দোকানঘরে তালা লাগিয়ে বলল, "এসো।"

ওরা সানন্দে ওর পিছু নিল। বিশেষ করে শুভঙ্কর তো খুব খুশি। ওর খুশির যেন অন্ত নেই। তার কারণ এই প্রথম ওর পাহাড় দেখা বা পাহাড়ে ওঠা। ওরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছে ক্ষণ মুহূর্তে তাও যেন ভুলে গেল। যেতে-যেতে শুভঙ্করই বলল, "আপনার নামটি কী ?"

"আমার নাম গুইরাম মাহাতো।"

"আর এই পাহাড়টার ?"

"এই তো একটু আগেই বললুম, চাতন পাহাড়। এই রোদে হেঁটে এতদূরে কষ্ট করে এসেছ তাই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমিও প্রায় বছর-দুই উঠিনি এখানে।"

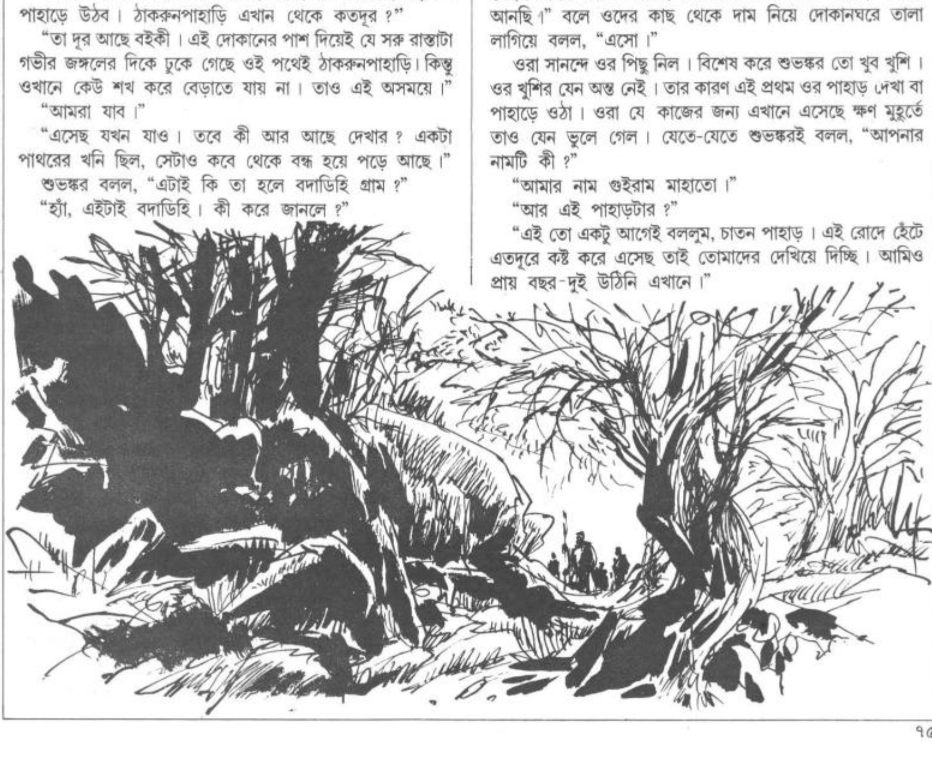

রাজজ্যোতিষী

কমলেন্দু সরকার

রাজার এখন ভীষণ বিপদ
শনি দিয়েছেন 'কিলা' ।
জ্যোতিষী বলেন, 'পরুন এবার
সাত রতির এক নীলা ।'

সভাসদরা অবাধ্য খুব,
কেউ তাকে আর চান না,
জ্যোতিষী বলেন, 'পরুন না-হয়
ছ' রতি এক পান্না ।'

বিদেশে ঘুরে এলেন রাজন,
শরীরে তাঁর মেদ !
জ্যোতিষী কন, 'সবুর করুন,
নিন দু' রতি গোমেদ ।'

দেশে গোলমাল, প্রজারা বলছে
'রাজা বড় জাঁহাবাজ !'
জ্যোতিষী বলেন, 'ধারণ করুন
চার রতি পোখরাজ ।'

রাজাকে ঘিরিয়া ভারী বদনাম
দ্বন্দ্ব ভিতর-বাহিরে,
জ্যোতিষী বলেন, 'ঠিক করে দেবে
পাঁচ রতি-টাক হিরে ।'

পাথর পরেও গদি গেল শেষে,
ভ্রান্ত জ্যোতিষ-কলা !
জ্যোতিষী বলেন, 'পরুন রাজন
আট রতি শুধু পলা !'

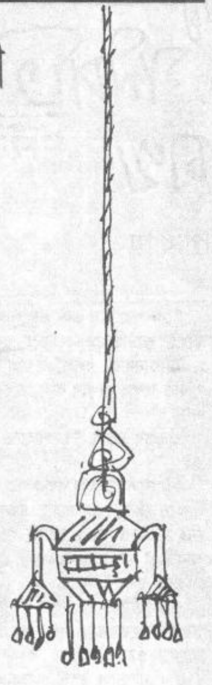

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বিল্টু বলল, "যা বন হয়েছে তাতে আপনি না থাকলে উঠতুমই না আমরা ।"

"এই রোদ্দুরে হেঁটে আসতে কষ্ট হয়েছে তো খুব তোমাদের ?"

"তা একটু হয়েছে বইকী ।"

"শীতকাল হলে এরকমটি হত না । এবার কখনও এলে তোমাদের আরও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসবে । আসবার আগে আমাকে একটা চিঠি লিখে দেবে । আমি তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব । তখন সারাদিন ধরে টো-টো করে ঘুরবে ।" বলতে-বলতেই একটা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে জঙ্গল ঠেলে ওদের নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল গুইরাম ।

এদের তো পাহাড়ে ওঠা অভ্যাস নেই । তাই খানিক ওঠার পরই যেন হাঁফ ধরে গেল বুকে । তবু উঠতে লাগল । এইভাবে সময় নষ্ট করার কোনও ইচ্ছেই ওদের ছিল না যদিও, তবুও পাহাড়ে ওঠার দুর্নিবার আকর্ষণ ওরা ছাড়তে পারল না । তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হল এই অচেনা এবং অজানার মাঝে সহজ-সরলভাবে কোনও মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগটাকেও ছাড়তে পারল না ।

ওরা পাহাড়ের অনেকটা ওপরে ওঠার পরই ছোট্ট একটি গুহা দেখতে পেল ।

গুইরাম বলল, "এই একটা গুহায় ভালুক থাকে ।"

"তাই নাকি ? এখনও আছে ?"

"থাকতে পারে । তোমরা কথা না বলে পা টিপে টিপে চুপিচুপি এসো । ওই ভালুকটার জন্যই তো এই লাঠিটা ভেঙে নিলুম । যদি বেরিয়ে আসে তো লাঠিটাই আগে ধরিয়ে দেব ।"

ওরা সভয়ে পা টিপে টিপে একদম কথা না বলে ওপরে উঠতে লাগল । এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা ।

আর খানিক ওঠার পর আর-একটি গুহাকৃতি ফাটল দেখিয়ে গুইরাম বলল, "এই যে দেখছ, এখানে অনেক সাজা পাখির বাসা ।"

শুভঙ্কর বলল, "সাজা পাখি কী ?"

"ও মা ! সাজা পাখি জানো না ? ওরা সাধারণত সন্ধের পর বের হয় । ওদের পালকে ছুঁচের মতো কাঁটা থাকে । ওই কাঁটা গায়ে বেঁধালে আর রক্ষে নেই ।"

বিল্টু বলল, "বুঝেছি । তুমি শজারুর কথা বলছ ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ । শজারু । তোমরা যাকে শজারু বলো, আমরা তাকেই সাজা পাখি বলি । এর কাঁটা দিয়ে আমাদের মেয়েরা উল বোনে ।"

কথা বলতে-বলতে এবারে ওরা একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এল । এখান থেকে চারদিকের পার্বত্য প্রকৃতির যে দৃশ্য ওরা দেখল, তাতে মন ভরে গেল ওদের । পাহাড় তো নয় । যেন মহাসমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ 'তিষ্ঠ' বলে থামিয়ে দিয়েছে কেউ ।

গুইরাম বলল, "ওই দ্যাখো, ওই হচ্ছে চিতি পাহাড়, ওই কুঁড়োল । আর ওধারের ওই যে পাহাড়গুলো দেখছ, ওগুলো হচ্ছে ড্রোং-শ্রেণী ।" বলে এক জায়গায় অল্প সমতলে একটি বিবর্ণ লাল পতাকার সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল গুইরাম ।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে কোনও দেবতা আছে বুঝি ?"

গুইরাম হেসে বলল, "দেবতা কোথায় নেই বাবা ? আসলে বছর দুই আগে একবার আমি একটু আনন্দ করে চাঁদা-টাঁদা তুলে এখানে চব্বিশ প্রহরার হরিসভা বসিয়েছিলাম । তা ইচ্ছে ছিল বছর-বছরই হরিসভাটা দেব । কিন্তু এইসব জায়গায় গরিব দুঃখী অনুৎসাহী লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা তোলাটা যে কীকেলেঙ্কারির ব্যাপার তা বলে বোঝানো যাবে না । এ ছাড়াও হরিসভার দিন কিছু লোক এমন

একটা গণ্ডগোল পাকালে যে, বাধ্য হয়েই পরের বছর থেকে বন্ধ করে দিলুম। আমার একার পক্ষে তো ওই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "সে তো বটেই। এসব কাজ একার দ্বারা হয় না।"

গুইরাম বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানো, ইদানীং মানুষজনও সব অন্যরকম হয়ে গেছে। ভাল লোকের চেয়ে বদ লোকে ছেয়ে গেছে চারদিক। ভাল কথা বললে মন্দ হয়ে যায়। কথায়-কথায় খেপে ওঠে।"

"কেন, এরকম হল কেন?"

"সে তোমরা ছোট ছেলে বাবা। তোমাদের আর কত বোঝাব? ওসব তোমরা বুঝবে না।। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কিন্তু সহজ-সরল মানুষ আমরা। তবে এখন কী জানো, আমাদের ভেতরেও বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কথা চিন্তা করার কেউ নেই। নেতাবাবুরা ভোটের আগে একবার করে আসেন। মঞ্চে উঠে ঝরঝর করে কাঁদেন। এমন ভান দেখান, যেন তাঁদের ঘরের বউ-ছেলের চেয়েও আমরাই বেশি আপন। সবই আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝেই বা করবটা কী? দিকে-দিকে অরণ্যের নিধন হয় আর আমরা উৎখাত হই। আমরা বাস্তুহারা হতে-হতে আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে, আমাদের থাকার মতো কোনও জায়গা নেই। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, আমরাও তেমনই অরণ্য ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমরা যে অরণ্যেরই সন্তান। আমাদের সেই অরণ্যটুকুও আজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য অরণ্যের নিধন আমরাও যে করছি না তা নয়। পেটে টান পড়লেই গাছপালা কেটে বেচে দিচ্ছি। কেউ-কেউ তো চোরা পথে রীতিমত ব্যবসাই শুরু করে দিয়েছে। যাক আমাদের এই সব দুঃখের কথা তোমরা বুঝবে না। তা এইরকম নানাবিধ কারণেই হরিসভাটা বন্ধ হয়ে গেল! আবার যদি কখনও ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তো হবে।"

তিন্নি বলল, "তোমাদের এখানে লোকজন তা হলে এখন আর আগের মতো নেই।"

"ওই তো বললাম দিদিভাই। বদ লোকে একেবারে দেশটা ছেয়ে গেছে। আগে আমরা কত ভাল ছিলুম। বিশ্বাসী ছিলুম। এখন সব বিষিয়ে গেছি। এখন লোকের জিনিস কেড়ে খেতে শিখে গেছি।"

তিন্নি বলল, "আচ্ছা গুইরামদা, শুনেছিলুম তোমাদের এখানে নাকি কে একজন কুখ্যাত ডাকাত আছে, জঙ্গল শের না কী যেন নাম?"

গুইরাম হেসে বলল, "ডাকাত! হাঃ হাঃ। সেদিনের ছোকরা তীর-কাঁড় ফেলে বন্দুক ধরেছে। রিভলভার হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ওইসব ফুটুনি বাইরে করবে ও, এখানে নয়। বন্দুক ফেলে শুধু হাতে একবার এসে আমার সামনে দাঁড়াক না ও, এক ঝটকায় ওকে চিত করে দেব আমি। অবশ্য বন্দুক-রিভলভার হাতে নিলেও আমাকে ও দারুণ ভয় করে। আমি ওকে হুঁশিয়ার করে বলেছি, তোমার জন্য যেন আমাদের বদনাম না হয়। এই জঙ্গলমহলে কোনওরকম দৌরাত্ম্য চলবে না তোমার। বরং এইখানে যেন কোনও অন্যায় বা অবিচার না ঘটে, সেইদিকে লক্ষ রাখবে। বাইরে তুমি যা ইচ্ছে করো।"

"এখানে তা হলে ও কোনও উপদ্রব করে না?"

"না। তা ছাড়া এখানে ও থাকেই বা কতক্ষণ? কখন আসে কখন যায়, তা টেরও পায় না কেউ। পুলিশের তাড়াতুড়ি খেলে বা চুরি-ডাকাতি করে কিছু পেলে কোনও গুহা-টুহায় লুকিয়ে রাখে। দু-চারদিন থাকে। আবার পালায়। তবে ইদানীং ও একটু বেশি

বেপরোয়া হচ্ছে।"

"কীরকম?"

"ওকে ঘিরে কিছু বদ লোকের আনাগোনা এখানে দেখতে পাচ্ছি। কিছুদিন দেখব। তারপর ওর ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে মেরে তাড়াব ওকে। ইতিমধ্যে এইখানকারই দু-একটা বদ ছেলেকে টাকাপয়সা দিয়ে হাত করে দলে নিয়েছে ওর।"

তিন্নি হঠাৎই গুইরামকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দাদা, আপনি আমাদের দারুণ একটা বিপদ থেকে রক্ষে করুন। আমাদের এই বিপদে একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমি আপনার ছোট বোন। আর এরা আপনার ভাই। সেই ভেবে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।"

গুইরাম বিস্মিত হয়ে বলল, "তোমাদের সাহায্য করব! কিসের বিপদ! সব কথা খুলে বলো আমাকে। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে নিশ্চয়ই করব।"

শুভঙ্কর বলল, "এতক্ষণ যার কথা হল, অর্থাৎ ওই জঙ্গল শের। আমরা ওর ব্যাপারেই কিছু বলতে চাই।"

"বলো তো কী ব্যাপার!"

"ওই জঙ্গল শের আমাকে মেরে ফেলবার জন্য লাথি মেরে চিলকিগড়ের কাছে ডুলুং নদীতে ফেলে দেয়। আর আমার সঙ্গে আমাদেরই দলের একটি মেয়ে ছিল। তাকে সে নিয়ে পালায়।"

বিল্টু আর তিন্নি বলল, "আমরা তারই খোঁজে এখানে এসেছি দাদা। শুনেছি ও নাকি ঠাকরুনপাহাড়ির জঙ্গলে থাকে।"

সেই মুহূর্তে গুইরামের মুখের অবস্থা দেখলে শয়তানও ভয় পেত। শুধু এরাই যা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল বলে পেল না।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(ক্রমশ)

রাজকুমারী অমৃতা কাউর কলেজ অব নার্সিং

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা হিসেবেই ১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক এই কলেজ অব নার্সিং স্থাপন করেন। ১৯৭৪ সালে এই কলেজটির নামকরণ করা হয় রাজকুমারী অমৃতা কাউর কলেজ অব নার্সিং।

কী কী বিষয় পড়ানো হয়

এই কলেজে নার্সিং-এ বি.এসসি অনার্স কোর্স পড়ানো হয়। এটি চার বছরের কোর্স। এই কোর্সের উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীকে এমন একজন পেশাদার সেবাকর্মী তৈরি করা, যাতে তিনি রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য এবং সেইসঙ্গে অসুস্থ রোগীর পরিচর্যা করে তাঁকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। এই কলেজে পাঠক্রম এমনভাবে শেষ করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-কলমে কাজের তালিমও নিতে পারেন। এখানকার স্নাতক স্বাধীনভাবে সেবামূলক যে-কোনও গুরুদায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন এমনটি আশা করা মোটেই অন্যায় হবে না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে সিনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট, ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট (দ্বাদশ শ্রেণীর কোর্স) পরীক্ষায় অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১০+২ পর্যায়ে) চারটি বিষয়ে (অর্থাৎ ইংরেজি, ফিজিকস, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি) কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। তবে আলাদা-আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে পাশ করা দরকার। প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স (১ অক্টোবর তারিখের ভিত্তিতে) ১৭ বছর হওয়া চাই। তবে উপাচার্য প্রার্থীর ব্যক্তিগত মেধা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে বয়স আরও ৬ মাসের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারেন। মনে রাখতে হবে, এই নার্সিং অনার্স কোর্সটি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই।

আমাদের দেশে নার্সিং শিক্ষার যে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, তাদের মধ্যে দিল্লির রাজকুমারী অমৃতা কাউর কলেজ অব নার্সিং অন্যতম। এই কলেজের বিভিন্ন পাঠক্রমের মধ্যে বি.এসসি নার্সিং (অনার্স) পাঠক্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) নার্সিং শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

(২) এই পাঠক্রম শেষ করার পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি (অনার্স) নার্সিং ডিগ্রি পাওয়া সম্ভব হয়।

(৩) এই কোর্স শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য।

(৪) চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় মাসিক দুশো টাকা হারে সরকারি বৃত্তি পাওয়া যায়।

(৫) পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্ক এবং প্র্যাকটিক্যালের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৬) হস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক।

(৭) দৈহিক প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

মনোনয়নের পদ্ধতি

মনোনয়নের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বি.এসসি নার্সিং অনার্স কোর্সে ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এজন্য তিন ঘণ্টা সময়ের এক লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার প্রশ্ন থাকে অবজেকটিভ ধরনের। সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুল (১০+২) পরীক্ষার পাঠক্রম অনুসরণ করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচিত হয়। সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত উভয় ক্ষেত্রের প্রার্থীদেরই এই পরীক্ষায় বসতে হয়।

এই পরীক্ষা নেওয়া হয় সাধারণত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ ছাড়া ইংরেজি কমপ্রিহেনশন এবং ভোকাবুলারির ওপরও প্রশ্ন করা হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্নও থাকে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মেরিট লিস্ট তৈরি করা হয় এবং মেধার ক্রম অনুসারে প্রতি বছর মোট ৪৫ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

পাঠ্যসূচি

আমরা আগেই জেনেছি, বি.এসসি নার্সিং অনার্স কোর্স চার বছরের। প্রথম বছর সাধারণত ফান্ডামেন্টালস অব নার্সিং, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োফিজিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি,

অমর দাশ

বায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি এবং ইংরেজি বিষয় পড়ানো হয়। ছাত্রীদের হাসপাতালে এবং কমিউনিটি সেন্টারে নার্সিং বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল করতে হয়। প্রথমে ক্লাসরুমে সব দেখানো হয়, তারপর পাঠানো হয় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। ক্লিনিক্যাল শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে চলে কাজে লাগানোর অভিজ্ঞতার তালিম।
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বিশেষভাবে

নিউট্রিশন, ডায়েটিটিকস, সাইকোলজি, এপিডেমিলজি, প্রিভেনটিভ মেডিসিন, মেডিকেল-সার্জিক্যাল নার্সিং, প্যাথলজি এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে পড়ানো হয়। এই সময়ে প্রতিটি ছাত্রীকে সপ্তাহে ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা ক্লাস করতে হয় এবং হাসপাতালের ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে প্রায় ৩০ ঘণ্টার মতো প্র্যাকটিক্যাল করতে হয়। এ ছাড়া ৪৮ ঘণ্টার ফিল্ড প্র্যাকটিস করানো হয় বিশেষ করে সেবাযত্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য।
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে চাইল্ড কেয়ার, সোশিওলজি, সাইকিয়াট্রিক, কমিউনিটি হেলথ অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক নার্সিং, মিড-ওয়াইফরি বিষয়ে পড়ানো হয়।
এই সময় পড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ শেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ৩৬ ঘণ্টার মতো ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হয় এবং ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা ক্লাস করতে হয়। উপরন্তু প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার হাসপাতাল প্র্যাকটিসও আছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্র্যাকটিক্যাল পাঠক্রমে বেশি জোর দেওয়া হয়।
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী মোটের ওপর ইন্টার্নশিপ বছর। এই সময় প্রতি সপ্তাহে ৪৬-৪৮ ঘণ্টা প্র্যাকটিক্যাল করতে হয়। ছাত্রীরা প্রতি মাসে এ-সময়ে ২০০ টাকা হারে সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর আরও আকর্ষণ হল,এই সময়ে প্রশাসন, শিক্ষকতা, সামগ্রিক কুশলতা বিষয়েও পাঠ নিতে হয়। সংখ্যাতত্ত্ব এবং গবেষণা বিষয়েও তাঁদের শেখানো হয়। কেননা এ-বছরেই তাদের গ্রুপ প্রোজেক্ট রিপোর্ট জমা দিতে হয়। সাইকিয়াট্রিক নার্সিং বিষয়ে হাতে-কলমে শেখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ মাসের জন্য দিল্লির বাইরে বাঙ্গালোর কিংবা রাঁচিতে পাঠানো হয়।

আসন সংরক্ষণ

এই কলেজে তফসিলি জাতি উপজাতি ছাত্রীদের ছাড়াও আরও কিছু ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যেমন, যেসব সামরিক কর্মচারী যুদ্ধে নিহত কিংবা দৈহিকভাবে কাজের ক্ষমতা হারিয়েছেন তাঁদের স্ত্রী ও মেয়ের জন্য এখানে সংরক্ষিত আসন আছে।

পাঠক্রমের গুরুত্ব

বি.এসসি অনার্স নার্সিং কোর্সের চাহিদা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। কেননা এই কোর্স পাশ করে স্নাতক হওয়ার পর বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভাল চাকরি পাওয়া সম্ভব। আর শুধু দেশেই কেন, বিদেশেও চাকরি জোটানো মোটেই কষ্টকর নয়।

মনোনয়ন তালিকা

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকা (মেধা অনুসারে) প্রকাশ করা হয় এবং কলেজের নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই ছাত্রীদের ভর্তি হতে হয়। ভর্তির সময় বার্থ সার্টিফিকেট, বিভিন্ন পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট, দু' কপি পাসপোর্ট সাইজের ফোটো, রিপোর্টসহ বুকের এক্সরে ফিল্ম ইত্যাদি জমা দিতে হয়।

পড়াশোনার খরচ

এই কলেজে পড়াশোনার খরচ তেমন একটা বেশি নয়। টিউশন ফি ১৫০ টাকা, লাইব্রেরি ডিপোজিট, ইউনিফর্ম ডিপোজিট ইত্যাদি বাবদ ২৫০ টাকা, হস্টেল ফি (বিদ্যুৎ ও জলের জন্য) ১২০ টাকা, মেসিং চার্জ ২২৫ টাকা। এ ছাড়া রেজিস্ট্রেশন ফি, ইউনিভার্সিটি এনরোলমেন্ট ফি, গেমস ফি, হেলথ ফি প্রভৃতিও দিতে হয়।
কলেজের প্রাপ্য টাকাকড়ি মেটাবার ব্যাপারেও কতকগুলো নিয়মকানুন আছে। মেসিং চার্জ প্রত্যেক মাসের দশ তারিখে অগ্রিম দিতে হয়। হস্টেল, ইলেকট্রিসিটি, গেমস, হেলথ ফি কোয়ার্টারলি ইনস্টলমেন্টে দিতে হয়। পাঠ্যবই

ছাত্রীদের নিজেদের কিনতে হয়। এ ছাড়া শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও খরচ ছাত্রীকেই বহন করতে হয়। ছাত্রীদের ফিল্ডওয়ার্কের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিবহণের ব্যবস্থা করেন।

অন্যান্য নিয়ম

ছাত্রীদের কলেজ হস্টেলে থাকতে হবে এবং সব ছাত্রীকেই শতকরা ৭৫ ভাগ থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হাজির থাকতে হয়। কলেজের লাইব্রেরিতে পাঠকক্ষে পড়ার সুযোগ আছে। এ ছাড়া ইনডোর এবং আউটডোর গেমসেরও সুযোগ আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

ভর্তির ফর্ম এবং অন্যান্য বিষয়ে পত্রালাপ করতে হলে চিঠি লিখতে হবে, প্রিন্সিপাল, রাজকুমারী অমৃতা কাউর কলেজ অব নার্সিং, লাজপত নগর, নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ঠিকানায়।

আবেদন করার নিয়ম

কলেজের নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে ভর্তির দরখাস্ত করতে হয়। সাধারণত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সেইভাবে কলেজ অফিস থেকে বিনামূল্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম দিনের মধ্যেই আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হয় (ক) রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫ টাকার পোস্টাল অর্ডার। (খ) সিলেকশন টেস্ট ফি বাবদ ১০ টাকার পোস্টাল অর্ডার (দুটি পোস্টাল অর্ডারই প্রিন্সিপাল, আর এ কে কলেজ অব নার্সিং, নয়া দিল্লির অনুকূলে কাটতে হবে)। (গ) সার্টিফিকেট অব হেলথ। (ঘ) বিভিন্ন পরীক্ষার মার্কশিটের প্রত্যয়িত নকল। যদি শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দি পড়ে থাকেন, তা হলে সেই মর্মে একটি সার্টিফিকেট। (ঙ) বার্থ সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। (চ) প্রশংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল। (ছ) দু' কপি পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ। (জ) দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল ত্যাগের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল ইত্যাদি।

ছবি : দেবাশিস দেব

ক্যাম্পাস

কালনা মহিষমর্দিনী ইনস্টিটিউশন

ছাব্বিশ জানুয়ারি কিংবা পনেরো অগস্টের দিনটি যখন বিউগ্‌ল আর ড্রামের আওয়াজে মুখর হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় কালনা মহিষমর্দিনী ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররা কোদাল, কাস্তে, ঝুড়ি নিয়ে নেমে পড়ে জঞ্জাল সাফাই, রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও নর্দমা সংস্কারের কাজে। পরিবেশ দূষণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছে। নিজের পরিবেশকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে-তকতকে রাখা যে একটি সামাজিক কর্তব্য, এই চেতনা ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে এই স্কুল খুবই তৎপর বলে জানালেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক অমরপতি কুমার। ১৯৪২-এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কেটে গেছে আটচল্লিশটি বছর। খেলাধুলো, কর্মশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে ছাত্ররা আজ যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হল আন্তঃপ্রাদেশিক কবাডি খেলা। সেখানে পশ্চিমবাংলার অধিনায়ক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ আনজার আলি। জেলাস্তরে দৌড়, খো-খো ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করল শুভেন্দু মুখার্জি। মহকুমাস্তরে খো-খো প্রতিযোগিতায় কাঙালি মোল্লা, কবাডিতে প্রাণেশ হালদার ও সুশান্ত পাল জয়ী হয়ে স্কুলের সুনাম বাড়িয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুব্রত পালের অঙ্কন ও ভাস্কর্য দেখে অবাক হতে হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পুরস্কার তার বাঁধা। ইটের গায়ে হাতুড়ি ছেনি দিয়ে যখন ছুটন্ত ঘোড়া বা শিবাজির মূর্তি ফুটিয়ে তোলে, তখন তার দক্ষতার প্রমাণ মেলে। নবম শ্রেণীর সুরেশ মণ্ডল, অমিতাভ গুহ ও চন্দ্রনাথ নস্কর কুইজ মাস্টার এবং অষ্টম শ্রেণীর অভিজিৎ হালদার, চন্দন ব্যানার্জি, রাজু সাহা আর দশম শ্রেণীর নির্মল

জঞ্জাল সাফাই অভিযান

দাস দক্ষ আবৃত্তিকার বলে মহকুমা পর্যায়ে ইতিমধ্যে অনেক প্রশংসা ও পুরস্কার পেয়েছে।
বিজ্ঞানের দিক দিয়েও পিছিয়ে নেই এই স্কুল। বিড়লা বিজ্ঞান সেমিনারে বর্ধমান জেলা থেকে পুরস্কৃত হল এই বিদ্যালয়ের ছাত্র শৈবালকুমার রায়। আর-একজন ছাত্র বাদলকুমার মান্না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ আয়োজিত বিজ্ঞান সেমিনারে বিশেষভাবে সম্মান লাভ করেছে।

তবে এই সমস্ত কৃতিত্বের মূলে যাঁদের অবদানের শেষ নেই, সেই তিনজন শিক্ষক হলেন—ধীরেন্দ্রনাথ বাজপেয়ী, মুকুল আহমেদ মোল্লা ও শুভ্রশুচি পান।

অনন্যার ছবি সুন্দর

অনন্যার বয়স যখন চার, তখনই সে ছবি এঁকে প্রথম পুরস্কার পায়। বর্তমানে তার বয়স পনেরো বছর। চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এখন অনন্যা দত্ত। এর মধ্যে তার পুরস্কার প্রাপ্তির সংখ্যা ৩৫০-এর বেশি। আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ফিনল্যান্ড থেকে সিলভার ও ব্রোঞ্জ, হাঙ্গারি থেকে ১৯৮৪ সালে ডিপ্লোমা এবং শঙ্কর ইন্টারন্যাশনাল থেকে পর পর ছ'বার পুরস্কৃত হয় অনন্যা। প্রথম দু' বছর পায় রুপো। এর পর চার বছর পেয়ে আসছে সোনা। তার আঁকা ছবিগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রপতি আর-

অনন্যার আঁকা ছবি

বেঙ্কটরমন পৃথকভাবে অনন্যার শিল্পকর্মের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। অনন্যার ছবি প্রকৃত জীবনেরই ছবি। নিখুঁত কাজ। অপূর্ব পরিবেশন গুণ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ-বছর অনন্যা 'স্টার মার্ক' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে এখন দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ১৯৯০ শঙ্কর ইন্টারন্যাশনালের 'সোনা' এবারও তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সমীর ঘোষ

বইয়ের খবর

জাদুঘরে আজব কাণ্ড

বইটির নাম 'লুলু অ্যান্ড দ্য ফ্লাইং বেবিস' । লিখেছেন এবং ছবি এঁকেছেন পসি সাইমন্ডস । লুলু নামের একটি ছোট মেয়ে একদিন মিউজিয়াম বা জাদুঘরে গেছে তার বাবা আর ভাইয়ের সঙ্গে । শীতের বিকেল । বাইরে বরফ পড়ছে । রবিবার বলে জাদুঘরেও ভিড় নেই । বাবা আর ভাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে লুলু সারা জাদুঘরে এখান-ওখান করছে । প্রাচীন ছবি ও মূর্তি, কাচের ঘরে রাখা জিনিসপত্র, মমি— সব দেখতে-দেখতে একেবারে মগ্ন হয়ে পড়েছে লুলু । হঠাৎ সে বুঝতে পারল, পুরো জাদুঘরটাই জ্যান্ত হয়ে উঠেছে । ছবি থেকে বেরিয়ে দেবদূত তাকে নিয়ে গেল ছবির মধ্যে, তাদের দেশে । কতরকমের অভিজ্ঞতা, মজা, বিস্ময় আর আনন্দ নিয়ে ফিরে এল লুলু, তারই মন ভোলানো গল্প । চমৎকার এই বইটি প্রকাশ করেছেন কেপ সংস্থা, দাম : ৫·৯৫ পাউন্ড ।

দুই ভূত দু'রকম

প্রথম বইটির ভূত উপকারী । বন্ধুর মতো সাহায্য করে বিপদ থেকে রক্ষা করে । এলেনদের বাড়ির চিমনিতে থাকত এক ভূত । তার নাম রুফাস । তার আস্তানা ছিল ঠিক এলেনের ঘরের ছাদে । সেই রুফাসের সঙ্গে এলেনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল সহজে, দু'জনেরই বয়স কম । এলেন বাড়িতে একা থাকলেই রুফাস তাকে সঙ্গ দিত । মজার-মজার খেলায় রুফাসের জুড়ি নেই । একদিন এলেনের ভাই টবিকে রাক্ষসরা ধরে নিয়ে গেল । এলেন আর রুফাস বের হল টবিকে খুঁজতে । রুফাসের সাহস আর বুদ্ধির জোরে টবিকে ফিরিয়ে আনতে পারল ওরা রাক্ষসদের কবল থেকে ।
দ্বিতীয় বইয়ের মূলচরিত্র ম্যাগি আর তার দুই যমজ ভাই । তাদের মা নেই । বাবাকে নিয়ে তারা নতুন এক ভুতুড়ে বাড়িতে উঠে গেল । সে-বাড়ির ছাদে মধ্যরাতে পায়ের শব্দ শোনা যায়, কানে আসে রক্ত-জল-করা হাসির শব্দ । সবাই মিলে ছাদে উঠল একদিন, এই ভুতুড়ে রহস্যের সমাধান করতে । কী দেখল, কী জানল তারা ? ভাবলে ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে যায় ।
প্রথম বইটির নাম 'চিমনি উইচ ক্রিসমাস' । লিখেছেন ভিক্টোরিয়া হোয়াইট হেড । অর্চার্ড প্রকাশনা । দাম : ৬·৯৫ পাউন্ড ।
দ্বিতীয় বইটির নাম 'গোস্ট অ্যাবে' । লেখক রবার্ট ওয়েস্টাল । প্রকাশক ম্যাকমিলান সংস্থা । দাম : ৭·৯৫ পাউন্ড ।

ঘুমের দেশে

ঘুমের দেশটা কেমন ? কেউ কি জানে সেখানে কী-কী আছে, কেমন তার আবহাওয়া, প্রকৃতি ? রূপকথার মতো করে সেই গল্প শুনিয়েছেন মেরি পোপ অসবোর্ন তাঁর নতুন বই 'এ ভিজিট টু স্লিপস হাউস'-এ । একটি মেয়ে রাত্তির বেলা বিছানা থেকে উঠে হাঁটতে-হাঁটতে ঢুকে পড়ছে ঘুমের দেশে । সে-দেশ অন্ধকারে ভরা । একটা মেঘে-ঢাকা বাড়িতে থাকেন ঘুম । পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা চঞ্চল নদী, যার স্রোতে আর ঢেউয়ে সারাক্ষণ বেজে চলেছে গান । সেই বাড়িতে পৌঁছতে হয় গভীর বনের মধ্যে দিয়ে, সে-বন আবার হিংস্র জন্তুজানোয়ারে ভরা । মেয়েটি যেতে-যেতে দেখল ঘুমন্ত বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, আরও কত কী ! বাড়িতে ঢুকে ঘুমের সঙ্গে ভাব জমল কেমন করে সেই মেয়েটির··· অসামান্য ভঙ্গিতে কাহিনীটি ছোটদের কাছে পরিবেশন করেছেন লেখিকা । ভূমিকায় জানিয়েছেন, কাহিনীটি প্রাচীন কবি ওভিদের এক কাব্যাংশের দ্বারা অনুপ্রাণিত । কিন্তু এই সামান্য অনুসরণ কাহিনীর মৌলিকতাকে একটুও ক্ষুণ্ণ করেনি । ছবি এঁকেছেন মেলিসা বে ম্যাথিস । হারপার প্রকাশনা সংস্থা থেকে বইটি প্রকাশিত । দাম : ১১·৯৫ পাউন্ড ।

অভীক মজুমদার

হাওড়ার ইতিহাস

হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি
হাওড়া-৭১১ ১০৬
দাম : ৫ টাকা

কলকাতার তিনশো বছর পূর্তির পাশাপাশি হাওড়া শহরের পাঁচশো বছর পূর্তির সংবাদ আমরা অনেকেই জানি না ।
হাওড়া শহরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার কাজে ব্রতী হয়েছে 'হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি' । 'হাওড়া' নামের উৎস, হাওড়া শহরের ইতিহাস, বিদ্যাচর্চা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল আলোচনায় এই বইটি সমৃদ্ধ ।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

চারটে ভূতের গল্প
দিলীপকুমার চৌধুরী
ইন্ডিয়ান বুক মার্ট
কলকাতা-৭৩
দাম : ১০ টাকা

'ভূতের মুখে ভূতের কাহিনী' ! শুধু তাই নয়, মামদোর দুশ্চিন্তা'র কারণও জানা যায় । এইরকম সব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে গল্প । নব্বই পাতার ছোট্ট আকারের সঙ্কলনে রয়েছে চারটি গল্প । প্রচ্ছদটি সুন্দর ।

অঞ্জন সিকদার

হিন্দোল সর্দারের কেল্লা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
কামিনী প্রকাশনী,
কলকাতা-৯, দাম : ১৫ টাকা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ছোটদের মজার-মজার দুঃসাহসিক অভিযানের রহস্যঘন গল্পের লেখক । এই বইটিতে তাঁর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ছায়া পড়েছে । ট্রেন দুর্ঘটনা ও দুর্ধর্ষ ডাকাতির মধ্যে পড়ে কিশোর রঞ্জন ও কিশোরী শবনম । অন্ধকারে তারা ট্রেন থেকে নেমে কাছাকাছি জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয় । বন্দুক চালানো ও ঘোড়ায় চড়া শিখে, তারা হিন্দোল সর্দার ও বিক্রমজিৎকে কাবু করে কেল্লাটি দখল করে নেয় । বইটি ছোটদের পড়তে ভাল লাগবে ।

পরেশ সরকার

নানারকম

ধাঁধা

বিশ্বকর্মাপুজোর গায়ে-গায়ে মহালয়া, এমনটা দেখা যায় না বড় একটা। অন্তত আমার তো মনে পড়ে না। বিশ্বকর্মাপুজোর ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে অবশ্য প্রতি বছরই চোখে পড়ে যে, আকাশটা কখন আর কীভাবে যেন বদলে গিয়েছে। সেই থমথমে ভাবটা আর নেই। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, সত্যিই যেন ভাসিয়ে দিয়েছে কেউ। আর তখন থেকেই মনে আসে একটা পুজো-পুজো ভাব। কিন্তু এবার যেন সব কিছু তাড়াতাড়ি। বিশ্বকর্মাপুজোর ঘুড়িগুলো গুছিয়ে রাখতে-না-রাখতেই বেতারে ভোরবেলার মহিষাসুরমর্দিনী। তার মানে, সত্যি-সত্যি দুর্গাপুজো এসে গেছে। ছোট্কা অবশ্য কোনওদিনই পুজোর ছুটিতে কলকাতায় থাকে না। এবারও বেড়াতে যাচ্ছে। তবে এবার ছোট্কার আলাদা রকমের ব্যস্ততা। কেননা, ভারতেরই বাইরে যাওয়া। ক'দিন সমানে তাই পাসপোর্ট, ভিসা, ট্রাভেল এজেন্ট—এইসব কথা কানে আসছে। ছোট্কাকে ধরাই মুশকিল। কী ভাগ্যি, মহালয়ার দিন ছুটি ছিল। ছোট্কা বোধ হয় আমার মনখারাপ করে থাকার ব্যাপারটা আগেভাগেই আঁচ করেছিল। তাই নিজেই বলল, "ভয় কী সতুবাবু! ডাকে চিঠির সঙ্গে নতুন ধাঁধা আসবে। নতুন-নতুন স্ট্যাম্প পাবে, সঙ্গে নতুন-নতুন ধাঁধা।" অভয় পেয়ে আমি বলে ফেলি, "কিন্তু এখন যে ধাঁধা চাই ছোট্কা।"

তাই সাত সকালেই ছোট্কাকে পাকড়াও করলাম। কিন্তু, হা ঈশ্বর, বলে কী ছোট্কা! ধাঁধার খাতা নাকি ঢুকে গেছে একটা কোন বাক্সে। তাই এখন পাওয়া যাবে না। আমার তো শুনেই মনখারাপ। একে তো দিন পনেরো ছোট্কা থাকছে না, তায় ধাঁধার খাতাও থাকবে না বাড়িতে। এখন উপায়? ছোট্কা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "খাতা নেই, এটা ঠিক/ ধাঁধা নাও মৌখিক।" বলেই মুখে-মুখে ধাঁধা বলে গেল ছোট্কা। শুনবে, কী ধাঁধা!

প্রথম ধাঁধা ॥ দশটি সমান আকারের থলে। প্রতিটি থলেতে দশটি করে বাটখারা। বাইরে থেকে একরকম দেখতে প্রতিটি বাটখারা। কিন্তু আসলে সূক্ষ্ম তফাত আছে। ন'টি থলের প্রতিটি বাটখারার ওজন ১ কেজি করে। একটি থলের বাটখারার ওজন প্রতিটি ১১০০ গ্রাম। কোন্‌টি, সেটা বলা নেই। এখন, একটি নিখুঁত দাঁড়িপাল্লায় একবার মাত্র ওজন করে কীভাবে বের করা সম্ভব, কোন থলেতে বেশি ওজনের বাটখারাগুলো রয়েছে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ সেকালে কী ছিল যা একালে নেই?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

মাপকরানি

গতবারের উত্তর ॥ (১) তপন অবিবাহিত। সুতরাং সে নিশ্চিত বয়োজ্যেষ্ঠ নয় আর তার রোজগারও নয় সবথেকে বেশি। কেননা, সবথেকে যাঁর বেশি বয়স, তিনিই সব থেকে বেশি রোজগেরে এবং তাঁর খরচ হয় স্ত্রী-কন্যার জন্য। রাজীব সর্বকনিষ্ঠের থেকেও কম আয় করে। তা হলে তপন সর্বকনিষ্ঠ। রাজীবের রোজগার কম বলে জয়ন্তই সবথেকে বেশি বয়সী। (২) সমাস। (৩) সমানুপাতিক।

সত্যসন্ধ

কত কথা

'অমুকের করকমলে' বা 'অমুক করকমলেষু'—উপহার পত্রে এই ধরনের লেখা হামেশাই চোখে পড়ে। এখন এই 'করকমল' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট কটি এবং কী কী শব্দ পাওয়া যেতে পারে দ্যাখো তো!

২। আবার সেই এক শব্দের অক্ষর উলটে-পালটে অন্য শব্দ তৈরির খেলা। তিনটি শব্দ দেওয়া হল: (ক) প্রতিভা। (খ) বিকাল। (গ) প্রথম।

৩। দু' অক্ষরের চারটে শব্দ, তার আগে শূন্যস্থান। দু' অক্ষরের একই শব্দ ব্যবহার করো শূন্যস্থানে। কী দাঁড়াল এবার?

—গুহা
—পথ
—মাটি
—শৃঙ্গ

উত্তর : ১। কর, রক, রকম, কম, মল, কমল—মোট ছ'টি। ২। (ক) প্রভাতি। (খ) কাবিল। (গ) প্রমথ। ৩। গিরিগুহা, গিরিপথ, গিরিমাটি, গিরিশৃঙ্গ।

কথক

মজার খেলা

পুজোর ছুটিতে খেলনার মতো সহজ অথচ মজাদার একটা খেলা শিখব আমরা। বন্ধুদের দেখাব আর মজা করব। খুব সহজ খেলা। এ-খেলার জন্য দরকার আঠারোটি টুথপিক কিংবা পোড়া দেশলাই কাঠি। যা দিয়েই দেখাও, মাপে যেন কাঠিগুলো সমান হয়, সেদিকে নজর রেখো। কাঠিগুলো দিয়ে, পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইরকম, একটা তারার ছবি তৈরি করো টেবিলের ওপর।

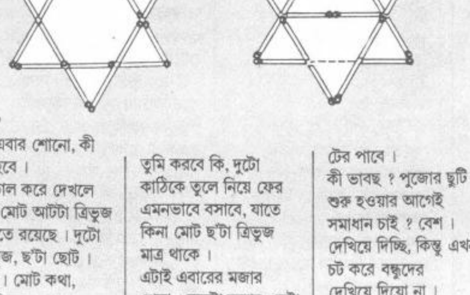

করেছ? বেশ। এবার শোনো, কী করতে হবে। ছবিটা ভাল করে দেখলে দেখবে, মোট আটটা ত্রিভুজ এই ছবিতে রয়েছে। দুটো বড় ত্রিভুজ, ছ'টা ছোট। সে যাক। মোট কথা, আটটা ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে। তুমি করবে কি, দুটো কাঠিকে তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে বসাবে, যাতে কিনা মোট ছ'টা ত্রিভুজ মাত্র থাকে। এটাই এবারের মজার খেলা। কতটা মজার, সেটা সমাধান করতে গেলেই টের পাবে। কী ভাবছ? পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই সমাধান চাই? বেশ। দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এখন চট করে বন্ধুদের দেখিয়ে দিয়ো না।

মজারু

ছবি : দেবাশিস দেব

Amul
MILK CHOCOLATE
বদমাইস মোটকার জন্যে
Amul
CRISP
MILK CHOCOLATE
ঘ্যানঘেনে পিংকির জন্যে
RADEUS/AMC/036/90-BEN
Amul
FRUIT & NUT
MILK CHOCOLATE
শয়তান ছোটকার জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
FLAVOURED
আমার সবচেয়ে আদরের প্রীতির জন্যে
Amul
Badambar
চামচা চিন্টুর জন্যে
Amul
CRUNCH
MILK CHOCOLATE
আমার টীচারের জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
Amul
Amul
MILK CHOCOLATE
এসবই
আমার জন্যে
বিক্রী ব্যবস্থায়:
গুজরাট কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিঃ
আনন্দ-৩৮৮ ০০১
আমূল চকোলেট — তোমার ভালোবাসার পাত্রের জন্যে সেরা উপহার!

ANANDAMELA 19 SEPTEMBER 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

পফ-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়।

রেফ্রিজারেটর আর আগের মত কেবল রেফ্রিজারেটরই নেই, কারণ গোদরেজ অজস্র গুণ ভরে দিয়েছে এতে – পফ-এর দৌলতে। আজ, এটি রেফ্রিজারেটরের জগতে এক নতুন মানদণ্ডের সৃষ্টি করেছে। এক সম্পূর্ণ নতুন অভিনব জাতের রেফ্রিজারেটর।

পফ কি?

পফ - এর পুরো নাম হল পলিইউরিথেন ফোম - সেই অসাধারণ ইনস্যুলেশন সামগ্রী, যা থাকে বিশ্বশ্রেণীর রেফ্রিজারেটরে।

পফ থাকে কোথায়?

পফ থাকে রেফ্রিজারে-টরের বাইরের বডি আর ভেতরের লাইনারের রন্ধ্রে - ফাঁকে।

পফ-ই বা কেন?

1. পফ থাকা মানেই হল ঠাণ্ডা আরো ঠাণ্ডা। পফ, ভেতরের শীতল ঠাণ্ডাকে সঠিক আবদ্ধ করে রাখে। যার ফলে, নতুন মজবুত কম্প্রেসরের কার্যকুশলতাকে আরো বাড়িয়ে তুলে, এক বিস্ময়কর পার্থক্য আনে।

2. পফ পয়সা বাঁচায়। পফ ঠাণ্ডাকে আরো বেশী সময় আবদ্ধ রাখে বলে কম্প্রেসরের মেহনত কম লাগে, মানে বিজলী খরচে বাড়তি সাশ্রয় করে।

3. পফ - রেফ্রিজারেটরকে দারুণ মজবুত বানায়। পফ এক মজবুত রক্ষাকবচের মত রেফ্রিজারেটরকে রক্ষা করে। যার ফলে, বাড়তি মজবুতির কারণে চোট - ধাক্কার ধকল অনায়াসে সহ্য করে।

4. পফ - জায়গা বাঁচায়। গ্লাসউলের তুলনায় পফ, ঘন নিবিড় ধরনের হওয়ার কারণে, রেফ্রিজারেটরের ওয়াল আরো ছিপছিপে পাতলা অথচ মজবুত গড়নের করা যায়। যার ফলে, রেফ্রিজারেটরটি হয় বাইরে দেখতে ছোট্টখাট্ট অথচ ভেতরটা বেশ বড়সড়।

5. পফ - ফিনিশকে ঝক্‌মকে রাখে। অন্যান্য রেফ্রিজারেটরের মত লিকুইড পেন্ট ব্যবহার না করে, গোদরেজ রেফ্রিজারেটরে থাকে এপোক্সি পাউডার কোটেড ফিনিশ, ফলে দাগ বা আঁচড় পড়ার আশংকা নেই। আর বাইরের গা কম ঘামে বলে, পফ ওপরের রঙীন ফিনিশটা বছরের পর বছর ধরে, নতুনের মত ঝক্‌মক্ রাখে।

পফ-ই কেন নয়?

যখন গ্লাসউল রেফ্রিজারেটরের দামেই প্রায় পফ-এর অজস্র গুণ পাচ্ছেন, তখন পফ সজ্জিত গোদরেজ নেয়াই তো সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, নয় কি?

আঁজ্ঞে হ্যাঁ, পফ শক্তির সত্যিসত্যিই জবাব নেই!

পফ সজ্জিত Godrej®

HTA 2838